(আচার্য্য)

গিরিশচন্দ্র মজুমদার

প্রকাশক—শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার,

৫৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৩২০।

মূল্য চারি আনা

কুন্তলীন প্রেস,
৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

এই পুস্তিকার বিষয়ীভূত আমার পরমারাধ্য পিতৃব্যদেব লোকান্তরিত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক জন ঋষিকল্প মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁহার নিষ্কলঙ্ক দেব-চরিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাওয়া আমার ন্যায় অকৃতী অধম সন্তানের পক্ষে "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুর্বামনঃ" বৎ ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু গুরুজনের আদেশ অলঙ্ঘনীয়, —ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পিতৃব্য-দেবের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পর তাঁহার পূতজীবন-কাহিনী সংক্ষেপে লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে আদেশ করেন, সেই আজ্ঞা শিরধার্য্য করিয়া, "সঞ্জীবনী" পত্রিকার জন্য, অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত, নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির ন্যায়, আচার্য্যদেবের ঘটনাবহুল জীবনের স্থূল স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া এক হ্রস্ব প্রবন্ধ লিখিয়া দিই। তখন কল্পনা করি নাই উহা আবার পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে হইবে। কিন্তু কৃষ্ণকুমার বাবু পুনরায় বলিলেন, "মাঘোৎসবের মধ্যে আচার্য্য মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির করিতেই হইবে।" অগত্যা, "সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, পারলৌকিক অনুষ্ঠান দিবসে আলোচিত জীবনচরিতও বিবৃত উপদেশ, কতিপয় সহানুভূতিসূচক পত্র এবং সংবাদপত্রের

অভিমত একত্র সন্নিবেশ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।

মাঘোৎসবে নানাদেশের ধর্ম্মপিপাসু উপাসকগণের সমাগম হইবে, আশা করি সকলে আদর্শ পুরুষ আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের জীবনের পুণ্যকাহিনী, আমাদের সমস্ত ক্রটী উপেক্ষা করিয়া, সাদরে গ্রহণ করিবেন।

এই মহৎ জীবনের উচ্চ আদর্শে যদি একটী জীবনও গড়িয়া উঠে, যদি কোনও ধর্ম্ম ও কর্ম্মপথের পথিক সংসারের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে যাইয়া, এই আলোক-স্তম্ভের আলোতে স্বীয় গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া লইতে পারেন, তবেই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইতি—

কলিকাতা,
৯ই মাঘ, ১৩২০।

নিবেদক,
শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার।

গিরিশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার।*

ব্রাহ্মসমাজের আজীবন সেবক, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, কর্ম্মী, ভক্ত, সাধক, দেবচরিত্র, পরম ভক্তিভাজন বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার গত ২২এ নবেম্বর, শনিবার, রাত্রি ১২॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১।২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল। জামাতাদ্বয় ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার বঙ্কুবিহারী চৌধুরী পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এত অকস্মাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে ইহা আশঙ্কা করেন নাই। নীলরতন বাবু ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ভগবান তাঁহার প্রিয় সন্তানকে ইহজীবনের কর্ম্মাবসানে ফুলের মত তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ —ব্রাহ্মসমাজ কেন সমগ্র বঙ্গদেশ—এক মহাপুরুষকে হারাইল, এক উজ্জ্বল আদর্শ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল! গিরিশচন্দ্র একাধারে সরলতা, বিনয়, উদারতা, জনহিতৈষণা,

* সঞ্জীবনী পত্রিকা-স্তম্ভে পূর্ব্বে প্রকাশিত।

তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বহু গুণরাশির অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, বক্তা, সেবক ও শিক্ষকরূপে তাঁহার দীর্ঘজীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয় এ স্থলে তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব হইবে না।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২৪ এ ভাদ্র, ইংরাজি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বীরতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীরতারার মজুমদারগণ বংশ-মর্য্যাদায় ও প্রতিপত্তিতে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত। এই দেশে ইংরাজ শাসন বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্ব হইতেই মজুমদার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ধন ও বিদ্যাগৌরবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহ রামহরি মজুমদার কার্য্য-ব্যপদেশে বরিশালে আইসেন, তিনি দশশালা বন্দোবস্তের প্রধান কর্ম্মচারী টম্‌সন্ সাহেবের খাজাঞ্চীর কার্য্য করিতেন; মুন্‌সেফী পদের সৃষ্টি হইলে তিনি উক্ত পদে উন্নীত হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন। গিরিশচন্দ্রের পিতৃব্য রামরাজা মজুমদার বরিশালে দায়রার আদালতে উকিলের কার্য্য করিতেন এবং কালীকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ মজুমদার বরিশাল

জিলার তৎকালীন অধিকাংশ জমিদারের এষ্টেটের আমমোক্তারের কার্য্য করিতেন। গোপীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ভ্রাতার কার্য্যভার গিরিশচন্দ্রের পিতা হৃদয়কৃষ্ণ মজুমদারের উপর পতিত হয়। হৃদয়কৃষ্ণ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার বলে কিয়ৎকাল মধ্যে সরকার পক্ষের সরবরাকার (Manager, Court of Wards) মনোনীত হন এবং বহুকাল প্রশংসার সহিত এই কার্য্য করেন। হৃদয়কৃষ্ণ অতি বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন, ৯১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিরিশচন্দ্রের মাতা দয়াময়ী ঠাকুরাণী বাখরগঞ্জ জিলার গাভা গ্রামের রতনকৃষ্ণ ঘোষ দস্তিদারের কন্যা। গাভার ঘোষ বংশ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয়। হৃদয়কৃষ্ণের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা, গিরিশচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র। হৃদয়কৃষ্ণের সন্তানগণমধ্যে গিরিশচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও সুশ্রী ছিলেন। পিতা হৃদয়কৃষ্ণ হইতে গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রভূত শারীরিক শক্তি, বালকোচিত সরলতা, হৃদয়ের বিশালতা, একান্ত নির্ভীকতা ও অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মাতা দয়াময়ীর সংযম, সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, আত্মসম্মান জ্ঞান, পরোপকারস্পৃহা, নিষ্ঠা ও দেবভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতা দয়াময়ী প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন। দয়াময়ীর গৃহ একটী দরিদ্রভাণ্ডার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি সর্ব্বদা পুরাতন

ঘৃত, মালীস তৈল প্রভৃতি নানা প্রকার ঔষধাদি গৃহে সঞ্চিত রাখিতেন। দুস্থ প্রতিবেশী রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে দয়াময়ীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া কখনও সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত হইত না। গিরিশচন্দ্রের জননী এমন তেজস্বিনী ছিলেন যে গ্রামবাসী আপামর সর্ব্বসাধারণই তাঁহাকে সভয়ে সম্ভ্রম করিত। দয়াময়ী পরম স্নেহময়ী জননী ছিলেন। পুত্রগণও মাতাকে রমণীকুলরত্ন বলিয়া আজীবন ভক্তি অর্পণ করিতেন। পুত্রকন্যাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে সন্তানবৎসলা মাতা কত কঠোর ব্রত উপবাসাদি অনুষ্ঠান করিতেন। সন্তানগণের, বিশেষ গিরিশচন্দ্রের (কারণ গিরিশচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিলেন) আহারের জন্য কতই যত্ন, কতই না আয়োজন করিতেন।

বাল্যজীবন :

গিরিশচন্দ্র বাল্যকালেই ভাবী উজ্জ্বল জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। পিতামাতা আত্মীয় স্বজন বালক গিরিশচন্দ্রের উপর অতি উচ্চ আশা স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতার অতি স্নেহের, আশার ও গৌরবের স্থল গিরিশচন্দ্র শৈশবে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতামাতার অত্যাধিক যত্ন ও আদরের ফলে অনেক বালকের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু পিতামাতার এই অতিশয় আদর ও যত্ন গিরিশচন্দ্রকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

হৃদয়কৃষ্ণের পুত্র স্বভাবতঃই হৃদয়বান, পরোপকারী, সমদর্শী, পিতৃমাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, গুরুজনে শ্রদ্ধাবান, ও বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠিলেন। শৈশব হইতেই গিরিশচন্দ্র বিনয়নম্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, দুর্নীতি দেখিয়া গিরিশচন্দ্র প্রাণে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেন এবং অনেক সময় স্থানান্তরে যাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। কিন্তু কখনও কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া কাহারও প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা গিরিশচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ ছিল।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের পড়াশুনায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল, তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল; চিত্র, রন্ধন ও সেলাই কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট নিপুণতা জন্মিয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় গিরিশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়; কিছু দিন স্বগ্রামে স্বর্গীয় রামকুমার ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন; পরে ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য বরিশালে পিতার নিকট গমন করেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল।

ছাত্র-জীবন ও দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যার্থীরূপে গিরিশচন্দ্র অসামান্য নৈতিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। দেশে তখন ঘোরতর দুর্নীতির

স্রোত প্রবাহিত ছিল। গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়িগণের মধ্যেও অনেকে দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। বহু স্খলিত চরিত্র যুবক বন্ধু তাঁহাকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু প্রভূত শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক শক্তিশালী গিরিশচন্দ্র অটল অচল ভাবে সমস্ত প্রলোভন ও প্রতিকূল ঘটনায় জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন, পাপীকে ঘৃণা করিতেন না। উচ্ছৃঙ্খল যুবক বন্ধুগণের সহিতও তিনি অবাধে মিলিত হইতেন। এইরূপে বহু মদ্যপায়ী চরিত্রহীন যুবক তাঁহার পবিত্র চরিত্র প্রভাবে নবজীবন লাভ করিয়াছে, পরশমণির পরশে সোণা হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র সম্পন্ন ঘরের ছেলে হইলেও ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে পালা ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। তখন কার্য্যস্থলে সপরিবারে বাস করা প্রচলিত ছিল না, ভৃত্যের দ্বারা পাক করান সমাজে নিন্দনীয় ছিল। গিরিশচন্দ্র রন্ধন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, মাংস ইত্যাদি ভাল কিছু রন্ধন করিতে হইলেই গিরিশ-চন্দ্রের ডাক পড়িত; নিজের পালার রান্নাত তিনি বরাবরই করিতেন, অন্য ভ্রাতাদের পালার দিনেও তিনি সাহায্য করিতেন।

কিছুকাল বরিশালে থাকিয়া পড়িবার পর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা জয়চন্দ্র মজুমদার আগ্রহ সহকারে গিরিশচন্দ্রকে

তাঁহার কার্য্যস্থল নোয়াখালিতে শিক্ষা-দানার্থে লইয়া যান। অল্প কিছুদিন নোয়াখালিতে থাকিয়া পরে গিরিশচন্দ্র ঢাকা যাইয়া পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হন। ভ্রাতা জয়চন্দ্র মজুমদার কিছুকালের মধ্যে ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় গমন করেন এবং গিরিশচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। জয়চন্দ্র বহুলোককে পোষণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার আলয়ে সমদর্শন বলিয়া একটা জিনিষের অভাব ছিল। আহারের ব্যবস্থার বিভিন্নতা, যত্নের তারতম্য প্রভৃতি সমদর্শনের অভাব সমদর্শী গিরিশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ভ্রাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া ছোট দুই সহোদরসহ ঢাকায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন।

পোগোজ স্কুল হইতে ১৮৬০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গিরিশচন্দ্র মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি ও একটী মেডেল প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ সনে গিরিশচন্দ্র ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময় গিরিশচন্দ্র যে রচনা শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা যে কোন প্রবীন লেখকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার বিষয় হয়। অগ্রজ হরিশ বাবু নর্ম্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন বিক্রমপুর বেতকা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য

করেন। গিরিশচন্দ্র তখন ঢাকায় পড়িতেন, ছুটী পাইলেই ভ্রাতার নিকট যাইতেন। উক্ত স্কুলে বিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী এক সভা ছিল, ভ্রাতার অনুরোধে সেই সভায় ক্রমে কতকগুলি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই কবিতাময় প্রবন্ধ সকল শেষে "স্বভাব-দর্শন" নামক পুস্তকাকারে অনুজ প্রতাপচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। নৈসর্গিক শোভা বর্ণনায়, ভাষাসম্পদে, প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি তীব্র সমালোচনায়, স্বদেশ-প্রেমিকতায়, গভীর আধ্যাত্মিকতায় প্রবন্ধ সকল অতি উচ্চ অঙ্গের কবিতার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

বন্ধু-প্রীতি।

বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তাঁহার ত্যাগের ও বন্ধুপ্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—বাঙ্গলা রচনা পরীক্ষায় তিনি ও তাঁহার সহাধ্যায়ী দীননাথ সেন তুল্য নম্বর প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলা রচনার জন্য একটী স্বর্ণপদক প্রতিবৎসর শ্রেষ্ঠ লেখককে উপহার প্রদত্ত হইত; দুই জন তুল্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন সুতরাং কি ভাবে পদক প্রদত্ত হইবে যখন এই প্রশ্ন উঠিল তখন তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন "আমি ৮৲ টাকা বৃত্তি ও অপর একটী পদক লাভ করিয়াছি, এইটী দীননাথকেই প্রদান করা হউক।" গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে পদক সেই বৎসর দীননাথকে দেওয়া হইয়াছিল।

সত্যানুরাগ।

গিরিশচন্দ্র যখন ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া নগরে নগরে উপস্থিত হইতে-ছিল, গিরিশচন্দ্রের নির্ম্মল মানসক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনীদ্বারাই সত্যধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া আচার্য্যরূপে কার্য্য করিতেছেন, ঢাকা নগরীতে ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন,—তত্ত্ববোধিনী পাঠ, অগ্রজের আদর্শ, ব্রজসুন্দর বাবু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত যে তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গিরিশচন্দ্র যে সত্য একবার উপলব্ধি করিতেন তাহা সমগ্র মন প্রাণ দিয়া ধারণ করিতেন; স্বার্থ, সুখচিন্তা, লোকনিন্দা কিম্বা সমাজের অত্যাচার তাঁহাকে সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিত না। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের নব অনুপ্রাণনা তিনি লাভ করিলেন, যখন তিনি ধর্ম্মকে জগতের সার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, অমনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্ম সাধনে দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন; মেধাবী ছাত্র, সম্মুখে উচ্চ আশা বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিলেন,

পার্থিব উন্নতির সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময় বরিশালে ব্রাহ্মোপাসকগণ প্রকাশ্যভাবে জনৈক খৃষ্টিয়ান বন্ধুর গৃহে প্রীতি-ভোজন করেন ; হিন্দু সমাজের নেতাগণের পক্ষে ইহা সহ্য করা অসম্ভব হইল, তাঁহারা এই ভোজন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সমাজচ্যুত করিলেন। গিরিশচন্দ্র অগ্রজ হরিশচন্দ্রের চিঠিতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা হইতে তাঁহাকে লিখিলেন, "দাদা! আপনি ভয় পাইবেন না, সমাজ আপনাকে ত্যাগ করিলেও আমরা তিন ভাই আপনার অনুবর্ত্তী হইব।"

বিবাহ।

গিরিশচন্দ্র যখন সব পরিত্যাগ করিয়া 'সেই একের' শরণ লইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার সংসারে অনাসক্তির ভাব টের পাইলেন এবং তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ তিনি কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন না, অবশেষে মাতার আকুল ক্রন্দনে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিতান্ত আগ্রহে তিনি প্রকাশ করেন যে, যদি ধর্ম্মভাবাপন্না শিক্ষিতা গৌরবর্ণা কোন পাত্রী পাওয়া যায় তবে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর ঢাকা জিলাস্থ বহর গ্রামের কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের

কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীকেই তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া হরিশ বাবু স্থির করেন। গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (পরে সাহিত্যসম্রাট বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর) পাত্রী দর্শনার্থ প্রেরিত হন, তাঁহার অনুমোদনের পর শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সহিত গিরিশচন্দ্র বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ হিন্দু মতে হইয়াছিল বটে কিন্তু কালীপূজা ও কতকগুলি দেশাচার ও স্ত্রী-আচার বর্জ্জিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী যে তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন উত্তর কাল তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ।

হরিশ বাবু প্রভৃতি প্রথম প্রবর্ত্তকগণ উপরোক্ত প্রীতি-ভোজনের কিছু দিন পরে কার্য্যোপলক্ষে বরিশাল ত্যাগ করেন ও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিহার করেন। কিন্তু সেই সময় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। গিরিশ বাবু এবার ঘনিষ্ঠ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ-দান করিলেন এবং ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অদম্য উৎ-সাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ হইল। সাংসারিক তথাকথিত উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের নবোন্নতির যুগে তিনি সঙ্গীতনায়ক, শাস্ত্রব্যাখ্যাকর্ত্তা,

আচার্য্য, উপদেষ্টা হইলেন। যখন কেশবচন্দ্রের উপদেশ, আরাধনা ও প্রার্থনার শক্তি কলিকাতা রাজধানীকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, তখন গিরিশচন্দ্রের ভাষাসম্পদ-পরিপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বাগ্মীতা উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে নবীন ভাবের অবতারণা করিল। তাঁহার কলঙ্কহীন দেবপ্রকৃতি পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্ব কার্য্যে এক অপূর্ব্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিল। ১৮৬৫ সনের ২৩ আগষ্ট (৮ই ভাদ্র) তাঁহাকে স্থায়ীভাবে উপাচার্য্যের পদে বরণ করা হয়। এই সময় স্বনামখ্যাত বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু সর্ব্বানন্দ দাস, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, বাবু রাখালচন্দ্র রায়, বাবু চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করেন। বরিশাল সমাজের পক্ষে দুর্গামোহন বাবু, গিরিশবাবু ও সর্ব্বানন্দবাবু এই তিন ব্যক্তির সম্মিলনকে ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যাইতে পারে। ইহাঁদের মানবীয় ক্ষুদ্র-শক্তির সমবায়ে এবং ঈশ্বরের করুণাস্পর্শে ইহা এক অপূর্ব্ব দৈবশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল; ব্রাহ্মধর্ম্মের ত্রিবিধ ভাব জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের একত্র সাধনা, এই তিন সাধু-পুরুষের সম্মিলনে সংসিদ্ধ হইয়াছিল।

গভীর আধ্যাত্মিকতা ও তাহার প্রভাব।

গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, ধর্ম্মসাধন, নরসেবা, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য প্রদান

করিতে আরম্ভ করিল। কত যুবক, কত প্রৌঢ় তাঁহার একাগ্রতা, নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন ও নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তিনি যখন ভক্তিগদগদ কণ্ঠে ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে ভগবানের আরাধনা করিতেন তখন ঘোর পাপীর মনেও সাময়িক ভক্তির সঞ্চার হইত, তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ উন্মত্ত হইয়া উঠিত। "Those who came to scoff, remained to pray"। লাহোর হইতে জনৈক ব্রাহ্ম লিখিয়াছেন, "প্রথমতঃ আমার ব্রাহ্মদের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল। একদিন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ গিরিশ বাবুর জলদ-গম্ভীর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। গিরিশ বাবুর সেদিনকার আরাধনা ও উপদেশ আমার মনে এমন গভীর ভাবে মুদ্রিত হইল যে আমি সে দিন হইতে সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হইয়া পড়িলাম।" যখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া গিরিশচন্দ্র নগরসঙ্কীর্ত্তন করিতেন আত্মহারা গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তখন হিন্দু সমাজের বিদ্বেষ ঘোরতর ছিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চরিত্রমহিমায় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। অনেককে বলিতে শোনা

গিয়াছে—"যদি কেহ ব্রাহ্ম থাকে তবে গিরিশ মজুমদার"। একবার ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবের সময় (১১ই মাঘ) সন্ধ্যার পর কতকগুলি গুণ্ডা সমাজমন্দিরে আসিয়া ঢিল পাটকেল ছুড়িয়া, চীৎকার করিয়া ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিল; বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী বেদি গ্রহণ করিয়াছেন, উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহিলাগণ, বালকবালিকাবৃন্দ ভয়ে জড়সড়, উপাসনা বন্ধ হইবার যোগাড়; গিরিশচন্দ্র এতক্ষণ উপবিষ্ট ছিলেন, যখন উপদ্রবের মাত্রা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষায় এমন গম্ভীর প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন যে তৎক্ষণাৎ সমস্ত অত্যাচার প্রশমিত হইল, গুণ্ডার দল বসিয়া পড়িল, মন্দিরে শান্তি সংস্থাপিত হইল। তাঁহার প্রার্থনার ভাষা এমন বিশুদ্ধ ও ওজস্বিনী ছিল, তাহাতে এমন আন্তরিকতা, গাম্ভীর্য্য ও সরলতা ছিল যে উহা শুনিলেই লোক মুগ্ধ হইত। শ্রীযুক্ত ভি, আর, সিন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি বাঙ্গলা জানি না, কিন্তু আপনি আজ যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ সংস্কৃতানুরূপ, আমি প্রত্যেক কথা বুঝিতে পারিয়াছি।"

এই সময়ের মধ্যে গিরিশচন্দ্র মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া "প্রার্থনামালা" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্র-রচিত "প্রার্থনা-

মালা” পড়িয়া কতলোক বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তৎকালীন বহু ব্রাহ্মদিগের গৃহে “প্রার্থনামালা” দৈনিক উপাসনার সময় ব্যবহৃত হইত।

গৃহত্যাগ।

গিরিশচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম হইবার পরও এক বৎসর পর্য্যন্ত মনোরমা দেবী বীরতারা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় বীরতারা হইতে মনোরমা দেবী স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, চিরজীবনসঙ্গিনী হইবার একান্ত ইচ্ছা স্বামীকে জ্ঞাপন করিলেন। যখন মনোরমা দেবী স্বামীর দুঃখ দারিদ্র্যের ভাগিনী হইতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাঁহাকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করা স্থির হইল। যেদিন তিনি স্ত্রী ও অনুজ প্রসন্নচন্দ্রসহ বীরতারা হইতে বহির্গত হন সেদিনকার শোকাবহ দৃশ্য বর্ণনাতীত। শত শত লোক নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহ হইতে গিরিশচন্দ্রের সংসার, সমাজ ও দেশত্যাগ ব্যাপার দেখিতে সমবেত হইল। সকলেরই হৃদয়ে বেদনা, মুখ মলিন, চোখে জল। মাতা কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন, পিতা কাতর ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, চারিদিকে ক্রন্দনের, হা হতোস্মির রোল উঠিল। মাতা প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, “গিরি, তুই আমাকে কোন দিন কোন বাক্য কি ব্যবহার

দ্বারা কষ্ট দিস্ নাই, আজ কেন আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতেছিস্?" মাতৃভক্ত গিরিশচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু যিনি মাতার মাতা, প্রিয় হইতে প্রিয়তম তিনি আহ্বান করিতেছেন, কে রহিবে ঘরে? মাতার বক্ষ হইতে গিরিশচন্দ্র নিজকে ছিন্ন করিয়া কিছুদূর দৌড়াইয়া অগ্রসর হইলেন। পিতার পদধূলি মস্তকে লইতে যাইয়া বলিলেন, "পিতঃ! এই দেহ আপনা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি আদেশ করিলে এই দেহের রক্ত দ্বারা আপনার চরণ ধৌত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।" পিতাও উদারভাবে উত্তর করিলেন, "আমার এই ৭০ বৎসরের বদ্ধমূল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার ধর্ম্মের অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমি বুঝিতেছি তুমি যে পথ ধরিয়াছ তাহাই খাঁটী পথ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি এই পথে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ কর।" শোকার্ত্তহৃদয়ে পিতা যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ।

গিরিশচন্দ্র সস্ত্রীক সানুজ দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন। এই সময়কার লোকগঞ্জনা, সমাজের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সব অগ্রাহ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র কিরূপ

শান্ত অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু বলিতেন "যাঁহার পেটে ক্ষুধার জ্বালা কিন্তু মুখে হাসি, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম।" গিরিশচন্দ্র এইরূপ খাঁটী ব্রাহ্ম ছিলেন। ধর্ম্মাচরণে, নরসেবায় যিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন তাঁহার চাকুরী করিবার অবসর কোথায়? গিরিশচন্দ্রের পারিরারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটী প্রচার-ভাণ্ডার স্থাপন করা হইল, বাবু দুর্গমোহন দাস ও বাবু রাখালচন্দ্র রায় মাসিক ১০৷১৫৲ টাকা দান করিতে লাগিলেন। মনোরমা দেবী গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের প্রকৃত সহায় হইলেন। গিরিশচন্দ্রের আয় অতি সামান্য হইলেও তাঁহার গৃহ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইল। কত বিধবা, কত দরিদ্র, কত ধর্ম্মপিপাসু গৃহবহিষ্কৃত সমাজচ্যুত যুবক তাঁহার গৃহে স্থান পাইয়াছে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই প্রসন্ন মনে তাহাদের সেবা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বাহিরের কাজ করিতেন, বাজার করিয়া আনিতেন, মনোরমা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। গিরিশচন্দ্রের পক্ষে তখনকার দিনে বাজার হইতে দ্রব্যজাত স্বহস্তে বহন করিয়া আনা যে কতদূর আভিজাত্যাভিমানশূন্যতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়, কারণ তাঁহার পিতা দয়কৃষ্ণ তখন বরিশালে যথেষ্ট প্রতাপপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন।

সমদৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্রের আর্থিক অভাব দেখিয়া যদি কোন বন্ধু তাঁহার গৃহ হইতে স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা ভাবগতিকে প্রকাশ করিতেন, তিনি তাঁহাকে বাধা দিয়া সহাস্যবদনে বলিতেন, "দেখ ভাই, যত দিন কিছু আছে একসঙ্গে থাইব, আবার যখন না থাকিবে একসঙ্গে উপবাস করিব, ভয় কি?" গৃহে সমতা রক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; বাজার হইতে মৎস্য আনিয়াছেন, কোন কোন মৎস্য অপেক্ষাকৃত বড়, কাহার পাতে বড় মাছটী পড়িবে, কাহাকে ছোটটী দিবেন, মনোরমা দেবী ইতস্ততঃ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্র ব্যবস্থা করিলেন—"দুই তিন জনকে একত্র এক থালায় বসাইয়া বড় ছোট মাছ একসঙ্গে দিয়া দেও।" একবার সারদা (গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্ম হইলে পর মাতা বীরতারা হইতে এই পরিচারিকাকে তাঁহার গৃহকার্য্যের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া সারদাকে তিনি চিরদিন অতিশয় স্নেহ যত্ন করিয়াছেন।) বাবুকে খাওয়াইবার জন্য কিছু ঘি কিনিয়া রাখিল, গিরিশ বাবু আহারে বসিলে সারদা ঘি নিয়া উপস্থিত। গিরিশ বাবু অপর সকলকে ফেলিয়া একাকী ঘি খাওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া উহাতে আপত্তি করিলেন, সারদা শুনিল না, বাবুর থালায় ঘি ঢালিয়া দিল। গিরিশচন্দ্র নিতান্ত বিরক্তির সহিত সে দিন আহার

করিলেন। দ্বিতীয় দিবস আবার সারদাকে ঐরূপ করিতে উদ্যত দেখিয়া গিরিশ বাবু না খাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে সারদা অনেক হাত পা ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া নিয়া আসে। বৃদ্ধ বয়সে যখন অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন তখন দেখাগিয়াছে চাকর চাকরাণীর প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন এবং বলিতেন "আমি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিব আর ইহাদের উপযুক্ত বিছানা দেওয়া হইবে না, আমি দুধ খাইব ইহারা পাইবে না, ইহা চিন্তা করিলে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।"

জনসেবা।

প্রেমময়ের প্রেমিক পুত্র গিরিশচন্দ্রের সর্ব্ব জীবে সমদয়া ছিল। অপরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইত। তাঁহার প্রাণঢালা নরসেবা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অশেষ শারীরিক শক্তি দিয়া সেবাব্রতের উপযুক্ত করিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অক্লান্তকর্ম্মা গিরিশচন্দ্র জাগিয়া, দয়াল নাম গাহিয়া সেবা করিতেন। যেখানে রোগ সেইখানেই গিরিশচন্দ্র

উপস্থিত ; কলেরা, বসন্ত, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আরম্ভ হইয়াছে, আত্মীয় স্বজন রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিপন্নের বন্ধু গিরিশচন্দ্র সেখানে মাতার ন্যায় রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন! সেবাব্রত সাধনে তিনি অতুলানন্দ লাভ করিতেন। বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হয়, কোন হিন্দু ভদ্র লোকের বাটীতে তাহার ভৃত্যের ঐ দারুণ রোগে মৃত্যু হয়। কলেরার নামে তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইত যে ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না, শ্মশানে যাওয়া দূরের কথা। গিরিশ বাবু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, শুনিলেন এক মৃত ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে দাহ করিবার কেহ নাই। গিরিশচন্দ্র আর কোথায় যান? বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিলেন "আমি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, শব ছুঁইলে তো কোন দোষ হইবে না?" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন—"দোষ গুণ বিচার এখন থাক, শব বাড়ী হইতে বাহির হইলেই বাঁচি।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একাকী শব স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইয়া দাহ কার্য্য সমাপন করিলেন। এই প্রকারে কত রোগীর সেবা, কত মুমূর্ষুর গতি, কত মৃতের শবদাহ তিনি একাকী করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার সম্বন্ধে একথা বেশ বলা যায়—"To relieve the wretched was his pride"—গিরিশচন্দ্র জীবন ব্যাপিয়া সকলের সেবা

করিয়া গেলেন কিন্তু কাহাকেও তাহার সেবা করিবার সুযোগ দিলেন না।

চাকুরী গ্রহণ ও তেজস্বিতা।

ধর্ম্মগতপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ধনোপার্জ্জনে স্পৃহাশূন্য ছিলেন। প্রচুর অর্থাগমের প্রশস্ত পন্থা তাঁহার নিকট উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু তিনি অর্থাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যে দুর্লভ শক্তি ও সাহসিকতার আবশ্যক তাহা তাঁহার ভিতরে যথেষ্টরূপে বর্ত্তমান ছিল। গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচার ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি মাসিক ২০৲ টাকা প্রাপ্ত হইবেন স্থির ছিল, কিন্তু ভাণ্ডারের অবস্থা সচ্ছল না থাকায় ঐ সাহায্য তিনি কখনও নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হন নাই। এদিকে পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, অনুজ প্রসন্নচন্দ্রের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে, প্রসন্নচন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে পড়িতেছেন, তাঁহাকে মাসিক ৭৲ টাকা পাঠাইতে হয়। গিরিশচন্দ্র দারিদ্র্যের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতেছেন দর্শনে পরহিতব্রত বন্ধু দুর্গামোহন দাস তাঁহাকে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওভারসিয়ারের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে

হইয়াছিল। তৎকালে মিঃ বিভারিজ বারগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা ছিলেন। একদিন মুসলমানদিগের একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহার কোন কার্য্যে অবিশ্বাস করিয়া সাহেব তাঁহাকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলেন। পুরুষসিংহ গিরিশচন্দ্র অমনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যে মুনিব অবিশ্বাস করে, তাহার অধীনে চাকুরী করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" তিনি তৎক্ষণাৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং ঘরে ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "মনোরমা, আমি এক কাজ করিয়া আসিয়াছি, সাহেব আমাকে অবিশ্বাস করায় আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি জানি ইহাতে তোমারই অধিক কষ্ট হইবে, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা আমি করিতে পারি নাই।" পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাঁহার ঐ কার্য্য পুনঃ গ্রহণের পথে দাঁড়াইয়াছিল। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে মিঃ বিভারিজ তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। গিরিশচন্দ্রের আজীবন বন্ধু দুর্গামোহন পুনরায় তাঁহার জন্য এক চাকুরী ঠিক করিলেন, বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক কার্য্যে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তৎস্থলে গিরিশচন্দ্রকে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন শুনিলেন যে একজনকে

অপসৃত করিয়া তাঁহার জন্য স্থান করা হইতেছে, তিনি এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কাহারও অনিষ্ট করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করা স্বার্থশূন্য, ন্যায়পরাণ গিরিশ চন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে বরিশাল জিলা স্কুলের তৎকালীন হেডমাষ্টার বাবু জগবন্ধু লাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় (৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে) বরিশাল জিলা স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি সমাজের বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। এই স্থলে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কুতূহলজনক ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন পূর্ব্ববঙ্গের স্কুলসমূহের তৎকালীন ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মার্টিন বরিশাল জিলা স্কুল পরিদর্শনান্তে স্কুলের আফিসগৃহে বসিয়া একে একে সমস্ত শিক্ষককে ডাকিয়া তাঁহাদের কিছু প্রার্থনীয় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই বেতনবৃদ্ধি, স্থান পরিবর্ত্তন, ছুটি ইত্যাদি বিষয় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। সাহেব যখন গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু প্রার্থনীয় আছে?" কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নিষ্কাম সাধক গিরিশচন্দ্র জ্ঞাপন করিলেন, "আমার বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই বলিবার নাই, আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যেন ভগবৎ কৃপায় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ না হই।" মার্টিন সাহেব সে বৎসরে শিক্ষকগণের মধ্যে একমাত্র গিরিশচন্দ্রেরই ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

'অর্থেষু বিগতস্পৃহঃ' সংসারে এমন ক'জন দেখা যায়? একবার দানবীর দুর্গমোহন দাস বন্ধু গিরিশচন্দ্রের পরিবারের সংস্থানের জন্য জীবন-বীমা করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ত্যাগী গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "দুর্গামোহন, আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য আমি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। তুমি যে অর্থদ্বারা আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছ সে অর্থ ব্রাহ্মসমাজে উন্নতি সাধনে ব্যয় করিলে আমি অধিকতর প্রীত হইব। আর জীবন মৃত্যু ঈশ্বরের দান, ইহা নিয়া এইরূপ ব্যবসা করা আমি সঙ্গত মনে করি না।"

শিক্ষকতা।

শিক্ষাক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র যে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিত মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত গত ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদী পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি একাধারে ছাত্রদিগের শিক্ষক, গুরু ও বন্ধু ছিলেন। ছাত্রদিগের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ স্কুলগৃহের ভিতর আবদ্ধ ছিল না। তিনি অনেক ছাত্রকে স্বগৃহে লইয়া যাইতেন, নানা প্রকারে তাহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার পত্নীও তাহাদিগকে মাতার ন্যায় যত্ন করিতেন। কেহ কেহ

মনোরমা দেবীর নিকট নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাস করিত, কত আব্দার করিত এবং সময় সময় কত বালকোচিত উপদ্রব করিত; গিরিশচন্দ্র নিজ ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। যে দিন দেবী মনোরমা প্রথম প্রকাশ্যভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে উপাসনা করেন সেদিন স্থানাভাবে বহু ছাত্র মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে গোল মাল করিতে থাকে, গিরিশচন্দ্র তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে পর তাহারা বলে, "আমরা আমাদের মায়ের উপাসনা শুনিতে পাইব না?" গিরিশচন্দ্র প্রতিশ্রুত হইলেন প্রতি শনিবার এক এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া পত্নীর উপাসনা শুনাইবেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ছাত্রগণ দলে দলে তাঁহার গৃহে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিত। তাঁহার গৃহ বিদ্যার্থী বালক, ধর্ম্মার্থী যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের এক মিলনক্ষেত্র ছিল। গিরিশচন্দ্রের অলৌকিক চরিত্রমহিমা, অকপট ধর্ম্মপরায়ণতা, মনোরমা দেবীর হৃদয়গ্রাহী উপাসনা এবং তদীয় দুহিতাগণের সুমিষ্ট সঙ্গীত দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহাদের পারিবারিক দৈনন্দিন উপাসনায় যোগ দিতেন।

চরিত্র-মাধুর্য্য।

একদিকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়, অপর দিকে সর্ব্ব বিষয়ে আড়ম্বরশূন্যতা, আহার বিহার পরিচ্ছদাদি

বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, মোটা কাপড়, মোটা ভাতে পরম তৃপ্তি, গিরিশচন্দ্র শিক্ষার্থীদিগের নিকট 'Plain living and high thinking'এর কি এক উজ্জ্বল আদর্শরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সরলতা, অমায়িকতার আধার গিরিশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের সহিত প্রাণ খুলিয়া সমভাবে মিশিতেন। গ্রামের ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল সকলের প্রতিই আশৈশব তাঁহার প্রাণের টান ছিল। বাল্যকালে যাহাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া ছিলেন আজীবন তাহাদিগকে সেই চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন। উত্তর কালে নিম্ন শ্রেণীর বন্ধুগণ গিরিশচন্দ্রকে দেখিয়া দূরে সরিয়া যাইত কিন্তু তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেন। তাহাদিগের সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইতেন। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া ধূমপান শিক্ষা করেন, ধূমপান বিষয় কোন কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, "তামাক আমার অনেক উপকার সাধন করিয়াছে, আমার হৃদয়ে আভিজাত্যাভিমান প্রবেশ করিতে দেয় নাই, বাল্যসহচরদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এমন উপকারী তামাক আমি ইচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারি না।" শেষজীবনে ডাক্তারের আদেশে তিনি তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি স্বয়ং বাজার করিতে ভাল বাসিতেন। বাজারের দোকানী সাধারণের সঙ্গেও তিনি

তাঁহার স্বাভাবিক অমায়িকতার সহিত আলাপ করিতেন। দোকানীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ভক্তি করিত, কেহ "বাবা", কেহ "দাদা" সম্বোধন করিত, ভাল ভাল পণ্যদ্রব্য তাঁহার জন্য বাছিয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিত, এবং তিনি উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার যাহা প্রয়োজন তাহাই দিত।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচেষ্টা।

যে সকল জনহিতকর কার্য্যে গিরিশচন্দ্র দেহের রক্ত জল করিয়াছেন স্ত্রী-শিক্ষা তাহার অন্যতম। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি নারীজাতির অধিকার বিষয়ে তাঁহার কেবলমাত্র মতের উদারতা ছিল না, তাহাদিগকে সকল উচ্চাধিকার দিবার জন্য হৃদয়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার দুর্দ্দমনীয় সাহস তাঁহার ছিল। তাঁহার স্ত্রী মনোরমা দেবী প্রথমতঃ সুশিক্ষিতা ছিলেন না, নানা সাধু কার্য্যে ব্যস্ততা এবং দারিদ্র্যজনিত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা দান করিবার অবসর তিনি করিয়া লইয়াছিলেন। মনোরমা দেবী দৈনিক পড়া প্রস্তুত করিতে না পারিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন এবং যে কোন প্রকারেই হউক সময় করিয়া দৈনিক পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইতেন। মনোরমা দেবী পাঠে কোনরূপ অমনোযোগ

প্রদর্শন করিলে তিনি অতি অদ্ভুত শাস্তি বিধান করিতেন —স্বয়ং আহার না করিয়া মনোরমা দেবীকে আহার করিতে বাধ্য করিতেন। মনোরমা দেবী স্বহস্তপ্রস্তুত খাদ্য স্বামীকে ফেলিয়া খাইতে বাধ্য হইয়া যে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন তাহাই ছিল তাঁহার যথেষ্ট শাস্তি। গিরিশচন্দ্রের এইরূপ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই মনোরমা দেবী, ঢাকা "ইডেন ফিমেল স্কুলের" যশস্বিনী শিক্ষয়িত্রী মনোরমা দেবী, প্রখ্যাতনামা প্রচারিকা মনোরমা দেবী, জগতের ইতিহাসে স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্ম্মসমাজের বেদির প্রথম অধিকারিণী মনোরমা দেবী, গড়িয়া উঠিয়া ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রযত্নে মনোরমা দেবী কত উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ১৮৮৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "The Brahmo Public Opinion" হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—

"Mrs. Manorama Majumdar is a self-made lady, her attainments in Bengali literature are of a pretty high order. She is held in high esteem by all who know her personally and the good she is quietly doing among her own sex in Barisal is worthy of all praise. Her abilities of preaching have long been well-known to all who ever attended her private prayer meetings. She is a better preacher than many of the preachers of the other sex. It is interesting to note that she was ordained a missionary of the Samaj in May 1881. In January 1883 she came prominently into the public

notice when at the Maghotshab she conducted the evening service of the regular Brahmo Somaj. This is the first time that an Indian lady publicly conducted Divine Service and preached a sermon before a congregation of men."

মনোরমা দেবীকে সমাজের বেদি হইতে আচার্য্যের কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়া লইয়া বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ঘোরতর মতদ্বৈধ হয়। তিন বৎসর বাদ প্রতিবাদের পর বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রমুখ তেজস্বী ব্যক্তিগণের আগ্রহে তাঁহাকে এই অধিকার দেওয়া স্থির হয়, কিন্তু অনেকের মত ছিল যে তিনি যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। যখন গিরিশ বাবুর মত জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি বলিলেন, "এইরূপ পবিত্র কার্য্যে স্ত্রীলোকের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া তোমরা যদি তাঁহাদিগকে সেই অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়া থাক, তবে তাহার প্রশস্ত সময় এই। পরদার অন্তরালে থাকিয়া ভগবানের পূজা করা ঐ পবিত্র কার্য্যের অবমাননা করা হইবে এবং পরিণামে তোমরা উন্নত সমাজের নিকট নিন্দনীয় হইবে মনে করি।" গিরিশ বাবুর এই উক্তিতে সকল মতান্তর দূর হইয়া গেল; মনোরমা দেবী প্রকাশ্য ভাবে বেদির কাজ করিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

গিরিশ বাবু, দুর্গামোহন বাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্মগণের প্রযত্নে ১৮৬৭ সালে বিবাহিতা মহিলা-দিগের শিক্ষার জন্য একটী স্কুল স্থাপিত হয়। বরিশালের

তৎকালীন জজ সাহেবর পত্নী মিসেস্ বেলফুর সাগ্রহে ইংরাজি ও সেলাই শিক্ষার সহায়তা করিতেন। ১৮৭১ সালে ইহাঁদের উৎসাহে স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা (Female Improvement Association) স্থাপিত হয়। এই সভা বহুদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সময়ে গিরিশচন্দ্র অদম্য উৎসাহ ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া, মহিলাগণকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া, অলস আলাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, লেখা, পড়া, সেলাই, রন্ধন ও সঙ্গীত শিক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রতি দিন নিয়মিতরূপে স্বর্গীয় রাখাল বাবু, দুর্গামোহন বাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু, জগৎ বাবু, হরকান্ত বাবু প্রভৃতির বাড়ীর মহিলাদিগকে ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পত্নীও শাশুড়ী মহাশয়াদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। গিরিশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া তাঁহার অবস্থাপন্ন বন্ধুগণ তাঁহাকে মহিলাগণের শিক্ষাদানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি স্ত্রী-শিক্ষা দিয়া অর্থগ্রহণ করিবেন না। স্ত্রী-শিক্ষা কার্য্যে গিরিশচন্দ্র কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বীয় কন্যাগণকে

কলেজের উচ্চ শিক্ষা দিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই, কিন্তু তাঁহার অবস্থানুসারে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাঁহার সযত্নরোপিত স্ত্রী-শিক্ষালতা যে সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সার্থকশ্রম হইয়া গিয়াছেন। স্বীয় দৌহিত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন দেখিয়া তিনি কত আনন্দ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

দেশানুরাগ।

পরহিতৈষণার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বান গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে যখন দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল, আমরা তখন গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। প্রতিদিন রাত্রি জাগিয়া খবরের কাগজ পড়িতেন, অপরকে শুনাইতেন, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ত্যাগমাহাত্ম্য দেখিলে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, যুবকগণ দেশের জন্য কি আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, কত লাঞ্ছনা শির পাতিয়া লইতেছে, আমি বৃদ্ধ আমার কিছু করিবার শক্তি নাই।"

গিরিশচন্দ্রের ঘটনাবহুল জীবনের শিক্ষাপ্রদ আখ্যায়িকাগুলি আজ উল্লেখ করিতে পারিলে দেশের মহৎ উপকার

সাধিত হইত, দুঃখের বিষয় এস্থানে তাহা সম্ভবপর হইবে না। আমরা দুই একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি :—

দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

লোক সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে নিগড় একবার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আর কদাচ পায়ে তুলিয়া লন নাই। জীবনের প্রারম্ভে যাহা কুসংস্কার কদাচার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যেও তাহা সেই চক্ষে দেখিতেন। একদিন যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, জীবনে কখনও তাহা আর গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সমাজ সংস্কারের দিনে গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—বিবাহে যৌতুক প্রদান কিম্বা গ্রহণ করিবেন না, স্ত্রী কি কন্যাকে অযথা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিবেন না। তিনি আজীবন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম দুই কন্যার বিবাহের সময় কলিকাতার বহু লোক যৌতুক লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, "আমার কন্যাদ্বয়কে আজ যে যাহা উপহার দিবেন সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি হইবে।" এই কথা শুনিয়া অনেকে যৌতুক প্রদানে বিরত হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অটল ছিলেন, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বজ্র হইতেও কঠোর ছিলেন, আবার চরিত্রমাধুর্য্যে কুসুম অপেক্ষাও কোমল ছিলেন।

আদর্শ গৃহস্থ।

সমাজের কার্য্যে, রোগী সেবায়, বহু সময় ক্ষেপন করিলেও তিনি স্বগৃহের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। His charity began at home. স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন। ভ্রাতৃবধূর কঠিন পীড়া হইয়াছে, রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিয়া ঔষধ পথ্য দিতেছেন, একদিন হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য নিদ্রিত হইয়া পড়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগিনীর ঔষধ সেবন হয় নাই, জাগিয়া যখন দেখিলেন ঔষধ সেবনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অস্থির ভাবে বলিতে লাগিলেন, "হা ভগবান! আমি কেন ঘুমাইয়াছিলাম? আমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

প্রাচীন ঋষির ন্যায় গিরিশচন্দ্র কর্ম্মকে পূজা জ্ঞান করিতেন। নিষ্কাম-সাধক সংসারে অনসাক্ত থাকিয়া কর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগী গিরিশচন্দ্র গৃহের সর্ব্ব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব লইতেন। কাহার কোন্ অভাব, কাহার কি দুঃখ সব মোচন করিবার জন্যই তাঁহার বিশাল হৃদয় ব্যাকুল হইত। তাঁহার দ্বারা পরিবারের কাহারও কোন ক্লেশ না হয় এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

প্রাতে ৮ টার সময় "ইডেন ফিমেল স্কুলের" গাড়ী আসিবে, প্রত্যুষে উঠিয়া বাজার করিয়া আনিয়া, স্নান আহার করিয়া মনোরমা দেবীকে অবসর করিয়া দিয়াছেন। গাড়ী আসিলে তাঁহার দ্বারে গাড়োয়ানকে যেন এক মিনিটও অপেক্ষা করিতে না হয় ইহা তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কোন দিন ঘটনাক্রমে ৫।৭ মিনিট দেড়ি হইলে স্কুলের গাড়ী বিদায় করিয়া দিয়াছেন এবং ভিন্ন গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজে স্ত্রী কন্যাকে স্কুলে দিয়া আসিয়াছেন।

দেনা, পাওনা সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার আচরণ অতি বিরল। কাহারও এক পয়সা পাওনা থাকিলে তাহাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিতেন না। ঢাকায় এক গোয়ালা হইতে কিছুদিন দুধ লইয়াছিলেন, বাড়ী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গোয়ালাকেও ছাড়িতে হইয়াছিল। একদিন স্ত্রীর নিকট শুনিলেন গোয়ালার কিছু পাওনা থাকা সম্ভব, অমনি ছুটিয়া গোয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকট তোমার কত পাওয়ানা আছে?" গোয়ালার কিছুই স্মরণ নাই, তিনি তাহাকে ডাকিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন, এবং হাতে দশটী টাকা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার প্রাপ্য স্বরূপ তোমাকে এই ১০টী টাকা দিলাম, যদি ইহা অপেক্ষা আমার নিকট তোমার বেশী প্রাপ্য থাকে তবে তুমি আমাকে তাহার জন্য ক্ষমা কর। আর যদি আমি তোমাকে বেশী দিয়া থাকি

তজ্জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" গোয়ালা অবাক, অগত্যা প্রণাম করিয়া ঐ টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

গিরিশচন্দ্র গৃহকে ঈশ্বরের মন্দির মনে করিতেন। গরীব হইলেও গৃহ প্রাঙ্গনটী ও গৃহাভ্যন্তর অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদ্যান তুল্য করিয়া রাখিতেন। কত শাক সব্জী, কত বিচিত্র পুষ্পপত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া গৃহখানি দেব-মন্দিরের ন্যায় শোভা পাইত। ঢাকা, ওয়ারীতে বাসকালে বাড়ীখানি লতা পুষ্পে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন যে লোক দেখিয়া মুগ্ধ হইত। স্কুল হইতে আসিয়া স্বামী স্ত্রী প্রতিদিন বাগানে জল সেচন করিতেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত যেন নগ্ন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি Adam ও Eve নন্দনকাননে বিচরণ করিতেছেন।

পবিত্রতার উপাসক গিরিশচন্দ্র পুত্র কন্যাদিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে পারিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার সন্তানগণকে কেহ কোন দিন মলিন বস্ত্র পরিহিত দেখেন নাই।

মানসিক শক্তি।

পান গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কিন্তু এক দিনের এক সামান্য ঘটনায় তিনি উহা একেবারে পরিত্যাগ করেন। সারদা পান সাজিয়া দিয়াছে, হাতের চূণ ঝাড়িয়া ফেলিতে দৈবাৎ উহা নিকটস্থ এক ভদ্রলোকের চোখের ভিতর যাইয়া

পড়ে, ভদ্রলোক চক্ষের যাতনায় কিছুদিন কষ্ট পান। তাঁহার পান খাওয়ার দরুণ এইরূপ এক অনিষ্ট উৎপন্ন হইল, সুতরাং সেই দিন হইতে তিনি উহা বর্জ্জন করিলেন।

জীবে দয়া।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" যাঁহার মূলমন্ত্র, তিনি কিরূপে মৎস্যমাংসাশী থাকিবেন? গিরিশচন্দ্র নিরামিষ ভোজী হইলেন। ২৫ বৎসর বয়সে যে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। একবার তাঁহার কঠিন পীড়া হয়, চিকিৎসার্থে কলিকাতা আসেন, ডাক্তার মৎস্য, মাংসের ব্যবস্থা করায় গিরিশচন্দ্র ডাক্তারকে জানাইলেন, "আমি ১২ বৎসর যাবৎ আমিষ ত্যাগ করিয়াছি, উহা পুনরায় গ্রহণ করিতে প্রাণে কষ্ট বোধ করি।" ডাক্তার বলিলেন, "তবে আপনার আমিষ ভক্ষণ করিতে হইবে না।" গিরিশচন্দ্র বাঁচিয়া গেলেন।

জীবন্ত বিশ্বাস।

ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবে গিরিশচন্দ্রের কি জীবন্ত বিশ্বাস ছিল! পুত্র দীনরঞ্জন কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর শোকে, অটল বিশ্বাসের সহিত পুত্রকে পরম পিতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা গগন ভেদ করিয়া মঙ্গলময়ের চরণোদ্দেশে উত্থিত হইল।

মনোরমা দেবী অধীরা হইয়া নিকটে পড়িয়া কান্দিতেছেন দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা, আজ এই পুত্র বিয়োগে আমার যতদূর কষ্ট হইতেছে, তাহা অপেক্ষা তোমার অবিশ্বাসজনিত অশ্রুপাত দর্শনে আমি অধিকতর কষ্ট অনুভব করিতেছি।" অমনি গভীর শোকে স্বর্গের সান্ত্বনা অনুভূত হইল, মনোরমা শান্ত হইলেন। ভগবানে কি আশ্চর্য্য নির্ভর, কি অলৌকিক আত্মসমর্পণ !

উদারতা।

একদেশদর্শিতা বা সঙ্কীর্ণতা তাঁহার চরিত্রে কখনই স্থান পায় নাই। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতর তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেম আবদ্ধ ছিল না। আমরা গিরিশচন্দ্রকে সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ ও অবিচলিত ভাবে স্বীয় মত ও কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে দেখিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-কারীগণ যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিজাতিয় বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিতেন, গিরিশচন্দ্রকে কখনও তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে শুনা যায় নাই। কাহারও স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের স্বাধীন ইচ্ছার উপরও তিনি কোন দিন হস্তক্ষেপ করেন নাই।

জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা।

গিরিশচন্দ্রের জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা চিরদিনই বলবতী ছিল। ঢাকা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন কলিকাতায় অবস্থিতি

করিতেছিলেন, সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাকে পুস্তকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে দেখা যাইত। অধ্যয়নে, জপে, তপে শেষ দিনগুলি সুন্দর কাটিতেছিল, ক্ষুদ্র হইতে ভূমার দিকে স্থির পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শেষদৃশ্য।

হঠাৎ গত বৎসর মাঘ মাসের শেষভাগে তাঁহার Angina রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জামাতা নীলরতন বাবু, বঙ্কুবাবু ও অন্যান্য আত্মীয় ডাক্তারগণ তাঁহার জন্য আশঙ্কান্বিত হন। কিন্তু কিছুদিন সুচিকিৎসার পর তিনি পুনরায় সুস্থতা লাভ করেন। গত কার্ত্তিক মাসে আবার ঐ দুষ্ট ব্যাধি অকস্মাৎ আক্রমণ করে। ডাক্তারগণ সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে অবসর, সম্পূর্ণ বিশ্রাম ব্যবস্থা করায় তিনি তদবধি সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতেন। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যার সময় একবার বুকে জ্বালা উপস্থিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১০।১২ মিনিট পরেই আবার রোগের উপশম হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বসিয়া তিনি নানাবিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করিতেছিলেন। একবার বলিয়াছিলেন "এই বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবশিষ্ট কার্য্য মৃত্যু, এইরূপ এক একটা হিল্লা অবলম্বন করিয়া হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন একমাত্র পরপারের কথা ভিন্ন অন্য কিছু আমার চিন্তায় আসে না।" তখন কে জানিত তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবার শেষ

মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়? ১২॥ ঘটিকার সময় কণ্ঠ যখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল তখন পার্শ্বস্থিতা কম্পমানা পত্নীকে বলিলেন "ভয় নাই, সংসার এইরূপই" নিকটে উপবিষ্ট পুত্রের প্রতি বাহুপ্রসারণ করিয়া অকম্পিত স্বরে বলিলেন "প্রেম রে, এই বুঝি আমার শেষ?" যাঁহার বাগ্মীতায় কত শত লোকের হৃদয় বিগলিত হইত সেই বাগ্মীপ্রবরের মর্ত্ত্যলোকে ঐ শেষ কথা।

তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন, বীরের ন্যায় যেমন অক্লেশে জীবন বহন করিয়াছেন, তেমনই সহজে পরপারে চলিয়া গেলেন। উর্দ্ধ হইতে আহ্বান আসিল আর বীর পুরুষ পশ্চাৎ পানে না তাকাইয়া ছুটিয়া গেলেন। ধন্য গিরিশ-চন্দ্র, তুমি জীবনেও ধন্য, মরণেও ধন্য।

সর্ব্বজনপূজনীয় গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-সংবাদ দ্রুতগতি নগরে প্রচারিত হইল, শত শত নরনারী মহাপুরুষের জীবলীলার শেষ দৃশ্য দর্শন করিতে সমবেত হইল। নব বস্ত্রে, পুষ্পমাল্যে পবিত্র দেহ সজ্জিত হইল। গিরিশচন্দ্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান বরিশালের প্রচারক বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ভক্তিগদগদ কণ্ঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলেন, ক্ষণিকের জন্য স্বর্গের সান্ত্বনা অবতীর্ণ হইল। সন্তানগণের আগ্রহে অন্তঃশয্যার একখানি চিত্র গ্রহণ করা হইল। সমবেত নরনারী পবিত্র চরণে শিরঃস্পর্শ করিয়া লইলেন। পরিবারবর্গকে কাঁদাইয়া ব্রহ্মনাম করিতে

করিতে দেহ বহন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গনে নীত হইল। সেই পবিত্র ক্ষেত্র পবিত্র দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্রতর প্রতিভাত হইল। মনোমোহন বাবু পুনরায় প্রার্থনা করিলেন। রবিবারের প্রাতঃকালীন উপাসনা ভঙ্গ হইয়াছে, উপাসক মণ্ডলী আচার্য্যকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। সীতানাথ বাবু প্রভৃতি চরণ স্পর্শ করিয়া পূত হইলেন। সংকীর্ত্তন সহকারে দেহ শ্মশান ক্ষেত্রে নীত হইল। তথায় বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে উপাসনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্মশান-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, গিরিশচন্দ্রের ভৌতিক দেহের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইল।

আমরা মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানে দুঃখ করিব না, তিনি মরজীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অমরধামবাসী হইয়াছেন। ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকের সম্বল সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আজ অমৃতময়ের ক্রোড়ে মধুরামৃত আস্বাদন করিতেছেন।

গিরিশচন্দ্র পার্থিব ধনসম্পত্তি কিছু রাখিয়া যান নাই, কিন্তু মানব সমাজের নিকট তিনি যে বহুমূল্য উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী হউক, তাঁহার দেবচরিত্রের কল্যাণকর প্রভাব দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হউক ইহাই সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শোকপ্রকাশ।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৯১৩ সনের ৩০শে নবেম্বর তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের উদ্ধৃতাংশ ঃ—

*   *   *   *   *

২। সভার কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয় এবং ইহার একখণ্ড প্রতিলিপি স্বর্গীয় আচার্য্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার মহাশয়ার নিকট প্রেরণ করা হইবে স্থির হয় ঃ—

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাষ্টি এবং আচার্য্য ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমন সংবাদে এই সভা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। স্থানান্তর গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুকাল তাঁহার নিঃস্বার্থ, পরহিতরত, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যপূর্ণ, আদর্শ জীবনের সাহচর্য্য ও উপদেশ, গভীর শিক্ষা ও অকৃত্রিম সেবা লাভ করিয়া বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ও তৎসম্পর্কিত নরনারিগণ পরম উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার বিদেশ গমনেও এই সমাজসম্পর্কিত কেহ তাঁহার স্নেহ ও অক্ষুন্ন ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত লাভে বঞ্চিত হন নাই, জীবন পথের পরম সহায়

এরূপ একজন আদর্শ পুরুষের অন্তর্দ্ধানে স্থানীয় সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। ২২শে নবেম্বর, শনিবার, রাত্রিকালে, কলিকাতাস্থ ভবনে, ৭৭ বৎসর বয়ক্রমকালে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার আনন্দপূর্ণ বিশ্বাসী সন্তানকে অনন্ত জীবনে আনন্দ দান করুণ এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা বিধান করুন।

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার মহাশয়ার নিকট প্রেরিত হইল।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীমন্মথমোহন দাস,
৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৩। সম্পাদক।

The East Bengal Brahmo Samaj Office,
2 & 3, Lyall Road, Dacca.
The 18th December, 1913.

সবিনয় নিবেদন,

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের অধিবেশনের নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ আপনার নিকট পাঠাইলাম।

নিবেদক
শ্রীমথুরানাথ গুহ
সম্পাদক,
পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা।

"ভক্তিভাজন, শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার পত্নীকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নির্দ্দেশ করিলেন যে আগামী ২১শে ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে ৭½ ঘটিকার সময় উক্ত মহাত্মার পরলোক গমন উপলক্ষে সমাজ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইবে।"

Sadharan Brahmo Samaj Office,
211, Cornwallis Street, Calcutta.
Dated the 10th January, 1914.

DEAR MADAM,

I beg to communicate to you the following two resolutions passed at the last meeting of the General Committee of the Sadharan Brahmo Samaj expressing their profound regret at the death of the late revered Babu Girish Chandra Mazumdar and conveying their sincerest sympathy to you in your sad bereavement. May the Merciful Father grant peace to the departed soul and consolation to you all.

I. Resolved that the General Committee of the Sadharan Brahmo Samaj deem it their duty to place on record the profound regret with which they have heard of the death of Babu Girish Chandra Mazumdar who throughout his long career served the cause of the Brahmo Samaj with unsurpassed devotion to work, loyalty to its principles and a true spirit of self-sacrifice and whose devout and exemplary life was a source of spiritual inspiration to all who came in contact with him.

2. Resolved also that the Committee express their sincerest sympathy with his widow and children in the sad bereavement that has befallen them.

I remain,
DEAR MADAM,
Yours most sincerely,
BARADA KANTA BOSE,
Asst. Secy., S. B. Samaj.

তৃতীয় অধ্যায়।

কয়েকখানি সহানুভূতিসূচক পত্র—

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস আচার্য্য মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার মহাশয়ার নিকট লিখিয়াছেন :—

ওঁ

বরিশাল,
৬ই ডিসেম্বর।

পরমশ্রদ্ধাস্পদাসু !

আমাদের সকলের পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মজুমদার মহাশয়ের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিয়া সকলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছি। তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পিতারূপে এত দিন নানা প্রকারে আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। ক্ষুরধারতুল্য স্বর্গের পথের সম্মুখে এত দিন তিনি আলোক-স্তম্ভের মতন দাঁড়াইয়াছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে আমরা এবং ব্রাহ্ম সাধারণ, বলিতে কি, সরল ধর্ম্মানুরাগী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুলোক নিজদিগকে আশ্রয়হীন মনে করিতেছি। সর্ব্বোপরি আপনার দারুণ শোকের কথা ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছি। একদিন তিনি আমাদের কোন মিলনক্ষেত্রে নিজের কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছিলেন "আমার এখন আর কোন বিষয়ে অভিমান নাই। পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজন সকলের প্রতি আমি অভিমানশূন্য হইয়াছি।

কিন্তু আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার অভিমান এখনও আছে, যাহা না থাকিলে আমি একেবারে মুক্ত হইতাম, যদিও আমার স্ত্রীর পক্ষে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।”

এই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহা স্মরণ করিয়া এই নিদারুণ শোক বহন করা আপনার পক্ষে কত দুঃসহ হইয়াছে ভাবিয়া আকুল হইতেছি। প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কৃপায় আপনার নির্ম্মল বিশুদ্ধ একান্ত নির্ভরশীল হৃদয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ হউক।

স্বর্গীয় আচার্য্য মহাশয়ের পারলৌকিক অনুষ্ঠান দিনে এখানে সমাজের পক্ষ হইতে মন্দিরে উপাসনাদি হইবে স্থির হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি কোন দিন উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য অবধারিত করিয়াছেন যথা সময়ে জানাইলে উপকৃত হইব। ইতি—

নিবেদন

আপনাদের স্নেহপালিত

শ্রীমন্মথমোহন দাস।

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কর্ত্তৃক লিখিত।

অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই একটি রত্ন হারাইলেন। ইঁহার সহিত আমার অতি মধুর সম্পর্ক ছিল; ইনি আমার প্রথম অধ্যাপক ছিলেন; ইঁহার নিকট প্রথম আমি

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়াছি। প্রায় ৪৮ বৎসর তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত ছিলাম; এই দীর্ঘকালে তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও সামাজিক জীবনে অনেক অসামান্য ভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি প্রথম জীবনেই অর্থের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদস্থ অনেক বন্ধুলোক তাঁহাকে ধনোপার্জ্জনের উপযোগী অনেক পদ অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। এই উপলক্ষে একটি কুতূহল-জনক ঘটনা ঘটে। একদা পূর্ব্ববঙ্গের ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় বরিশাল স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন; তিনি একে একে সমস্ত শিক্ষককে ডাকিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কি বাঞ্ছনীয় তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই বেতন বৃদ্ধি কি স্থানপরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু স্বর্গীয় গিরিশ বাবুকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,'আপনার প্রার্থনা কি?' তিনি বলিলেন—'আমার বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে প্রার্থনা নাই; আমি কেবল এই প্রার্থনা করি, যেন আমি ভগবৎ কৃপায় আমার কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ না হই।' আমাদের পাঠ্যাবস্থায়

বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামক ভাবে ঘটে। কোন হিন্দু ভদ্রলোকের বাটীতে তাঁহার ভৃত্যের ঐ রোগে মৃত্যু হয় ; কিন্তু তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল যে শ্মশানে যাওয়া দূরে থাকুক ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না। গিরিশ বাবু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন ; ঐ মৃত ভৃত্য পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, 'আমরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, শব ছুঁইলে ত কোন দোষ হইবে না ?' তদুত্তরে গৃহস্বামী বলিলেন, 'ছোঁয়া দোষ হওয়া দূরে থাকুক, শব বাড়ী হইতে নিষ্কাষিত হইলেই বাঁচি।' তখন গিরিশ বাবু একাকী শব স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইয়া দাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এই প্রকারে আর এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও তিনি অন্য একব্যক্তি মাত্র সঙ্গে করিয়া শবদাহ ব্যাপারে বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে ব্রাহ্মদিগের প্রতি 'খৃষ্টান' বলিয়া হিন্দুমাত্রেরই ভয়ানক অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় গিরিশ বাবুর অলৌকিক চরিত্র-মহিমায় এবং বালকোচিত সরল ব্যবহারে বরিশালবাসী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং বহু লোকেই বলিতেন, গিরিশ বাবু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও দেবতার ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার জীবন প্রকৃতই ধর্ম্মজীবন এবং তাঁহাতে ধর্ম্মের কোনও ছলনা নাই।

বরিশাল হইতে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক-রূপে পরিবর্ত্তিত হন; তথায়ও তিনি ঐ প্রকার আদর্শ জীবন প্রদর্শিত করেন এবং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হন। বরিশালে যে প্রকার আচার্য্যের কাজ করিতেন, ঢাকায় আসিয়া ঐ ভাবে নিরন্তর আচার্য্যের কাজ না করিলেও বহু সময়েই তিনি আচার্য্যের কাজ করিতেন।

তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মোপদেশে তিনি যে ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অসামান্য চরিত্র বল, একান্ত ধর্ম্মপরায়ণতা ও লোকহিতানুষ্ঠান ব্রতপরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই একটি ঋষিকল্প ব্যক্তি হারাইলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবানের অমৃতময় ক্রোড়ে তিনি চিরশান্তি লাভ করুন, ইহাই এখন তাঁহার সুহৃদ্‌জনের একান্ত প্রার্থনা।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম্, এ, বি, এল, মহাশয় আচার্যদেবের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সিউনি হইতে তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক বাবু ললিতমোহন দাসকে লিখিয়াছেন :—

তোমার পত্রে পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি শুনিয়া মনে হইল বঙ্গদেশ একটি রত্ন হারাই-লেন, এরূপ ঋষিকল্প লোক আরত বড় দেখিতে পাই না।

তাঁহার চরণপ্রান্তে দুই মিনিটের তরে বসিলেও যে শান্তি পাইতাম, তাহা আর কোথায় পাইব? এই অষ্টমী কি নবমী পূজার দিন তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী দেবীর চরণ-ধূলি নিতে গিয়াছিলাম, কতই স্নেহে কতই কথা বলিলেন, তখন ত স্বপ্নেও ভাবি নাই তিনি এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন। তাঁহার স্মৃতিই চিত্তকে উন্নত করে, আর যে ইহলোকে তাঁহার পদতলে বসিতে পারিব না, ইহা মনে হইলে কষ্ট হয়। বরিশাল ত তাঁহার স্মৃতিজড়িত, তাঁহার চরণরেণু দ্বারা বরিশাল পূত, বরিশালবাসী আমা-দিগের ইহাই সান্ত্বনা। তিনি, স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় বরিশালে যে কি অমৃত ঢালিয়াছেন তাহা বরিশাল ভুলিতে পারিবে না এবং তাহার স্মৃতিতে বরিশাল ধন্য। আমি ও আমার ন্যায় অনেকে তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী দেবীর নিকটে যে কত ঋণী তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। সেই দীনরঞ্জনের মৃত্যুর দিনে যে তাঁহার বাড়ীতে কি অপূর্ব্ব দিব্য ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহা জন্মজন্মান্তরে ভুলিব না। তাঁহার দেব-প্রতিম মূর্ত্তি দর্শন মাত্রই যে প্রাণে কি আরাম পাইয়াছি তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। আর অমন প্রাণ-ঢালা স্নেহ, দুই একজন ব্যতীত, কাহারও নিকটে পাই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার নিকটে বসিলে স্বর্গ নিকটতর বোধ হইত, প্রাণে সত্যই সুধা সিঞ্চিত হইত।

আজও তিনি প্রাণের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন এবং স্নেহভরে উর্দ্ধে তুলিতেছেন—ইহা আমার বিশ্বাস,—তিনি আমাদের হইতে বিযুক্ত হইতে পারেন না। কর্ত্তা তাঁহাকে ও আমাদিগকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য ও সান্ত্বনার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার ত ইহলোকেও জয়জয়কার পরলোকেও জয়জয়কার। বরিশালের নিতান্ত ব্রাহ্মদ্বেষী হিন্দুগণও তাঁহার নাম করিলে কিরূপ ধন্য, ধন্য করিতেন! স্বর্গীয় নন্দকুমার ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি কতই যে তাঁহাকে ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র কিরূপ পুলক প্রকাশ করিতেন তাহা বারবার মনে হইতেছে। সেই যে রবি বাবুর কবিতা ঃ—

"এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।"

তাঁহার জীবনে এই কবিতাটীর সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যই তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার সম্প্রদায়দ্বেষিগণের সহস্র বচন থামিয়া যাইত। এমন লোকের স্মরণেও আমরা ধন্য হইতেছি।

তুমি আমাকে যে অনুরোধ করিয়াছ তাহা আমি পালন করিতে অক্ষম, বরিশালে থাকিলে জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ

করিয়া কিছু লিখিতে পারিতাম, এখানে তাহা পাইব কোথায়? আর সংবাদ পত্রে লিখিবার মত এখন কিছু লিখিতেও পারি না। মিউনিসিপ্যালিটীর ওভারসিয়ারি ছাড়িতে তিনি যে তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন তাহার ইতিবৃত্ত ভাল মনে নাই। এরূপ অনেক বিষয়েই স্মৃতিকে ঝালাইয়া লওয়ার প্রয়োজন, তাই পারিলাম না। তিনি কি পীড়ায় দেহত্যাগ করেন এবং সে সময়ের অবস্থা ত কিছু লেখ নাই? তাহা জনিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিনী দেবী, প্রেমরঞ্জন, ভবরঞ্জন, ও তাঁহার কন্যা ও আত্মীয়দিগকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাইবে।

শুভানুধ্যায়ী

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া গিরিডি হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন মজুমদারকে লিখিয়াছেন:—

গিরিডি,

৪ঠা পৌষ, ১৩২০।

পরম স্নেহভাজনেষু,—

তোমার মুদ্রিত পত্র আজ পাইয়াছি। প্রায় দেড় মাস পরে আজ আমি বসিয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যখন তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের পরলোক গমন সংবাদ

পাইলাম তখন আমি শয্যাগত। এই সংবাদ পাইয়া কয়েক দিন আমি আমার মনকে সুস্থির রাখিতে পারি নাই। তিনি শুধু তোমাদেরই পিতা ছিলেন না, আমাদের অনেকেরই পিতা ছিলেন।

এক বাড়ীতে থাকিয়াও আমি যথোচিতরূপে তাঁহার কাছে বসিতে এবং তাঁহার স্নেহপূর্ণ বাক্য ও উপদেশ শুনিতে পারি নাই, মনে করিয়াছি ঢের দিন রহিয়াছে ইহার পরে শুনিব, কিন্তু কোন কাজই যে কল্যকার জন্য রাখা উচিত নয়, তাহা ভাবি নাই। এই দীর্ঘসূত্রিতার ফলে এমন অনেক জিনিষ হারাইলাম যাহা আর কখনও পাইব না।

তিনি কিরূপ ছিলেন তাহার বর্ণনা করিতে আমার শক্তি নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যেরূপ লোক জগতে কদাচিৎ জন্ম গ্রহণ করে তিনি সেইরূপ লোক ছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে মৃত ব্যক্তির গুণগান করিতে হয় ইহা শিষ্ঠাচার-সম্মত প্রথা। জীবিতকালে হাজার দোষ থাকিলেও সে দোষের কথা উল্লেখ করিতে নাই। কিন্তু তোমার পিতৃদেব সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই যে হাজার অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার একটীও দোষ খুঁজিয়া পাইতেছি না। সুতরাং তাঁহার কথা বলিতে গেলে শুধু গুণের কথাই বলিতে হইবে। তাঁহাকে মনে করিলেই একটী পুণ্যস্মৃতি সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। আমার চাটুকারিতার এমন শক্তি নাই যে আমি তাঁহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিব।

গিরিশচন্দ্র

আমি তাঁহাকে দূর হইতে দেখি নাই, সপরিবারে তাহারই আশ্রয়ে তাঁহার পবিত্রকুটিরে বাস করিয়াছি। কি আশ্চর্য্য অমায়িকতা, কি অপার্থিব সরলতা, কি অপূর্ব্ব উদারতা, কি স্বর্গীয় পরার্থপরতা! সমস্ত গুণগুলি যেন তাঁহার চরণে চিরশরণ লইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিলে প্রাণের সঙ্কোচ দূর হইয়া যাইত। কোনও প্রকারের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে পারিত না। ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ সকলকে তাহার ন্যায় সমান চক্ষে দেখিতে কে পারিবে? সেই হাসিমুখ আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেই হাসির সহিত সরলতা ও আত্মতৃপ্তি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা, এরূপ বিস্তৃত ও প্রগাঢ় ছিল যে আমার মনে হইত তাঁহার পেটের মধ্যে কত কি রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রেমরঞ্জন, আজ আমি ভগ্নশরীর ও ভগ্নহৃদয় লইয়া তাঁহার কথা কিছুই লিখিতে পারিব না, আবেগে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।

তাঁহার ন্যায় খাঁটি মানুষ জগতে অতিশয় দুর্লভ। তাঁহার সমস্তই খাঁটি ছিল, আদর অভ্যর্থনায় তিনি খাঁটি ছিলেন, সেবা শুশ্রূষায় তিনি খাঁটি ছিলেন, বিনয় ভদ্রতায় তিনি খাঁটি ছিলেন, এমন খাঁটি মানুষ আর দেখা যায় না। "দেখানো" ভাব তাহাতে আদবেই ছিলনা। এই ঘোর চতুরতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার যুগে তিনি সত্য ও সরলতার অবতার ছিলেন।

আজ একটী দৃশ্য মনে পড়িতেছে। আধ মাইল দূর হইতে মহাপুরুষ বাজার করিয়া আসিতেছেন, সুস্থ ও সবল দেহে যৌবনের পুণ্যপরিচয় প্রত্যক্ষ হইতেছে; কাঁধে একরাশ লম্বা লম্বা ডেঙ্গোর ডাটা, হাতে ১০।১২ সের ওজনের তরকারী প্রভৃতি, বগলে মোটা পিচের লাঠি, পায়ে চটিজুতা, গায়ে একখানা পাতলা উড়ানী, স্থির শান্ত চক্ষু আকাশে বিন্যস্ত, অসঙ্কোচে চলিয়াছেন, রাস্তায় একজন সব-জজের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি বলিলেন "মজুমদার মহাশয়, নমস্কার"; একজন বড় উকিল, বড় জমিদারের সঙ্গে দেখা হইল তাহারা বলিলেন "মজুমদার মহাশয়, নমস্কার"। তিনি একটু মাথা নোয়াইয়া সকলকে প্রতিনমস্কার করিলেন, একটু মৃদু হাসিতে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া চলিলেন, কোন সঙ্কোচ নাই, সঙ্কোচের লেশ মাত্র নাই। রোগীর সেবা অনেককেই করিতে দেখিয়াছি কিন্তু ওলাউঠার মল ও বমিকে তিনি যে ভাবে পরিষ্কার করিতেন তাহা দেখিয়া আমার মনে হইত যেন তিনি সুগন্ধ চন্দন ঘাটিতেছেন।

কোন কার্যেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা করেন নাই। সাধারণ লোকদিগকে যেমন বাহিরের কার্য্যদ্বারা চিনিয়া লওয়া যায় তাঁহাকে সেরূপ চিনিয়া লওয়া কঠিন ছিল, কেননা কোন কার্য্যেই তিনি আপনাকে প্রধান করিয়া তুলিতেন না, অথচ সকল কার্য্যেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

একদিন কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া

আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়ি, কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রই আমি একেবারে শান্ত হইয়া গেলাম। আমাদের মত দুর্দ্দমনীয় লোককেও তিনি অনায়াসে বশীভূত করিতে পারিতেন, কোন কার্য্যেই তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে আমাদের শক্তি ছিল না।

আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার এক পুত্র-রত্ন হারাইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ কি হারাইয়াছেন, তাহা বরিশালের লোকেরা অনুভব করিতে পারিবে।

আমি যখন কলিকাতা হইতে গিরিডি আসি, তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা এমন ছিল না যে, পুনরায় তাঁহাকে দেখিবনা বলিয়া মনে কোন আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। হঠাৎ তিনি চলিয়া গেলেন!

তাঁহার আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে তুমি তোমার পত্রে অনুরোধ করিয়াছ কিন্তু সে সাহস কি আমাদের হইতে পারে? তিনি যে লোকে গিয়াছেন সেই লোক প্রাপ্তির জন্য বরঞ্চ সকলের প্রার্থনা করা উচিৎ। তোমার মা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার স্বভাব এই যে অন্য লোকের শোকে ও তিনি বিহ্বলা হ'ন। এ বিচ্ছেদ তাহার পক্ষে কিরূপ বজ্রাঘাত তাহা অন্যে বুঝিবে না। এ সময় তাঁহাকে বৃথা প্রবোধ না দিয়া তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

অধিক কি লিখিব, তোমার পিতার পুণ্য তোমাদের

ভ্রাতাভগিনিগণের মধ্যে সঞ্চারিত হউক, ইহাই একান্ত প্রার্থনা। অসুস্থ দুর্ব্বল হস্ত আর চলিতেছে না।

তোমাদের

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় গিরিডি হইতে শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকারকে লিখিয়াছেন :—

গিরিডি,

২৪—১১—১৩

স্নেহের নির্ম্মলা,

তোমাদের বাবার পরলোক গমন সংবাদ পাইলাম। তোমাদের পিতার ন্যায় স্নেহশীল সন্তানবৎসল পিতার লোকান্তর গমনে তোমাদের প্রাণে যে দারুণ আঘাত লাগিবে, তাহাত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তোমরা তোমাদের পিতার দীর্ঘকালব্যাপী সদ্দৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষা গুণে এই আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি। তোমরাত দীর্ঘকাল পিতৃস্নেহের শীতল ছায়ায় বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছ,—অনেকের জীবনে যে এমন সুযোগ অতি অল্প কালের জন্যও ঘটে না।

তোমাদের পিতা আমাদিগের পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সাধুদৃষ্টান্ত ও চরিত্রবল আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল লোকদিগের পক্ষে অতি সহায় ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া

তোমাদের ন্যায় আমরাও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলদিগের সম্মুখে যে এরূপ মহদ্দৃষ্টান্তের আশ্রয়রূপ জীবন এত দীর্ঘকাল বর্ত্তমান ছিল তাহাও কল্যাণ বিধাতা প্রভু পরমেশ্বরের বিশেষ দান। এই দান হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তোমাদের পিতা জীবন্ত ইতিহাস রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের কত কথাই শুনিয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার নিকট হইতে যথা সময়ে তাঁহার মূল্যবান উক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

তোমাদের পিতার জন্য দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। কারণ তিনি তাহার জীবনের কর্ত্তব্য সকল এক প্রকার শেষ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তিনি এ লোকে থাকিতেই পরলোকের সম্বল সঞ্চয় করিতে সুযোগ পাইয়া ছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মসাধনে তিনি বিশেষ সিদ্ধি-লাভ করিয়া ছিলেন। পরমেশ্বরের নাম ও তাঁহার স্বরূপ আস্বাদনের আনন্দ তিনি লাভ করিয়া ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় হইয়া ছিলেন। সুতরাং পরলোকে যাহা মানবের পরম সম্পদ এ স্থান হইতে তিনি তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সে লোকে তিনি আরও কত উন্নত

আনন্দ সান্ত্বনা পাইবেন তাহা কে জানে? আমার এখন আর বেশী লিখিবার মত অবস্থা নহে, তাই আজ আর বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। আশা করি পরমেশ্বরের কৃপায় তুমি এ সময় ধীরভাবে এই শোকযাতনা সহ্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে। এ সময়ে বিশেষ ভাবে তোমার পিতার ধৈর্য্যগুণের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিবার অবসর উপস্থিত। তুমি তাহাতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

তোমরা আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমাদের দাদা বাবু।

চতুর্থ অধ্যায়।

পারলৌকিক অনুষ্ঠান।

আদ্যশ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশ:—

১৮৬৫ কি ৬৬ সালে আমি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হই। সেই সময় হইতেই আমরা বরিশালস্থ ব্রাহ্মগণের উৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা প্রভৃতির বিষয় শুনিয়া আসিতেছিলাম। আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু দুর্গামোহন দাস তখন বরিশালে ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মগণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কার্য্যে ব্রতী হইয়া-

ছিলেন। তাঁহারই দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ তথায় গিয়া ধর্ম্মপ্রচার, নারিগণের শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরিশালের ব্রাহ্মগণের কার্য্যবিবরণ সমগ্র বঙ্গদেশকে আলোড়িত করিতেছিল। আজ শোনা গেল নারিগণ স্বাধীন ভাবে বাহিরে আসিতেছেন, কাল শুনিলাম অগ্রণী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ সস্ত্রীক ইংরাজ-দিগের সহিত পান ভোজন করিলেন, পরশু শুনিলাম স্বদেশীয়গণের অত্যাচার নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া নানা জাতি একত্র প্রকাশ্যভাবে আহার করিলেন, তারপর দিন শুনিলাম দুর্গামোহন দাস নিজের এক বন্ধুর সহিত নিজের বিধবা বিমাতার বিবাহ দিলেন, আর একদিন শুনিলাম তাঁহারা এক ভৃত্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ভিন্ন জাতীয় এক বিধবার সহিত তাহাকে পরিণীত করিলেন ইত্যাদি। এই সকল সংবাদ লইয়া দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন চলিত এবং আমরা অর্থাৎ যুবক ব্রাহ্মদল বরিশালের সংবাদ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম। বরিশাল হইতে কোনও ব্রাহ্ম সহরে আসিলেই আমরা তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিতাম এবং বরিশালের ব্রাহ্মগণের কাজ কর্ম্মের বিষয় শুনিতাম। বরিশালের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহাদের উৎসাহ, কার্য্যোদ্যম, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের

কথা শুনিয়া আমরা পুলকিত হইতাম—গিরিশচন্দ্র মজুমদার তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। অন্যান্য বিবরণের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, সহৃদয়তা ও পরসেবার বিবরণ শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতাম। বরিশালের সর্ব্বশ্রেণীর লোকে বলিত "ওই একটা মানুষ যে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজকে সজাগ রাখিয়াছে।" কিছুদিন পরে দুর্গামোহন দাস মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া এখানকার হাইকোর্টের উকীলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং আমাদের অগ্রণী স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ও আমার স্বর্গীয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রধানরূপে সারথির কার্য্য করিতে লাগিলেন। ওদিকে বরিশালে গিরিশচন্দ্র মজুমদার, সর্ব্বানন্দ দাস প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ কর্ণধার হইয়া সেখানকার কাজ চালাইতে লাগিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং ইহার কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। বোধ হয় এই কালের মধ্যেই গিরিশ বাবু মহাত্মা থিওডোর পার্কারের সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনাগুলি বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া 'প্রার্থনামালা' নামে এক পুস্তক বাহির করিলেন। আমরা পার্কারের শিষ্য, পার্কার ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে আমাদের অনেককে অনুপ্রাণিত করিয়া-ছিলেন। আমার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়া আমি যখন ঘোর

আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছিলাম তখন আমার স্বর্গগত গুরু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে একখানি পার্কারের প্রার্থনা পুস্তক পাঠাইয়া দেন। সেই প্রার্থনা-গুলি আমার আধ্যাত্মিক অন্ন পান স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতে কি আনন্দ, কি বল পাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনীয় নহে। গিরিশ বাবুর প্রার্থনামালা যখন বাহির হইল তখন আমরা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। এখানি ঘরে ঘরে থাকা উচিত। আমি জানিয়া সুখী হইয়াছি গিরিশ বাবুর প্রার্থনামালা পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আমি বোধ হয় ১৮৮০ কি ৮১ সালে বরিশালে গমন করি। সেখানে গিয়া গিরিশচন্দ্র মজুমদার, সর্ব্বানন্দ দাস প্রভৃতি সমাজের বন্ধু-গণের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলাম। সেই সময়ে গিরিশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে দেখিবার অবসর হইল। সে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম তাহা আর ভুলিবার নয়। দেখিলাম সর্ব্বশ্রেণীর লোকে তাঁহাকে একজন সাধু-পুরুষ বলিয়া জানে; যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে—"উনি কি মানুষ—উনি একটী দেবতা"। তাঁহার সহৃদয়তা, বিনয় নম্রতা, অকপট সৌজন্য, মানবপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তি এ সকলের প্রশংসা ত শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁর দীনে দয়া ও নর-সেবার সুখ্যাতি যেন লোকের মুখে ধরে না। এক দিনের কথা মনে আছে, একজন হীনাবস্থ

মানুষের কি একটা সাংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন কি না তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় বন্ধু সেই কথা কহিতেছিলেন। একজন বলিলেন "ওহে শুনেছ ? অমুক লোকের এই পীড়া হয়েছে"। অপর ব্যক্তি বলিলেন "সত্যি না কি ? তবেই ত বিপদ, গিরিশ বাবু যদি শোনেন তা হলে গিয়ে পড়বেন, দিন রাত্রি গণনা করবেন না, এখন কি করা যায় ? এ কথাটা তাঁর কাণে না ওঠে এমন কি করা যায় না ?" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "তা কি হয় ? তিনি প্রতিদিন সেই পথে যান, প্রতিদিন বোধ হয় তাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকেন।" তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন "তবেই সর্ব্বনাশ, এখন গিরিশ বাবুকে লইয়াই ভাবনা।" আমি তাঁহাদের চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গিরিশ বাবুর নর-সেবা প্রবৃত্তির অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে লাগিলাম। তন্মধ্যে একটী গল্পের কথা সংবাদপত্রে সকলে পাঠ করিয়াছেন। এক ভদ্রলোকের একটী চাকর একবার বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিল, তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ কাছে নাই, কে তাহাকে শ্মশানে লইয়া যায়, কে তাহাকে দাহ করে, এই চিন্তায় গৃহস্বামী আকুল, এমন সময় গিরিশচন্দ্র মজুমদার সেই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত। তিনি বলিলেন, "আমি ইহাকে দাহ করিয়া আসিতেছি" এই বলিয়া একাকী তাহাকে শ্মশানে লইয়া গেলেন। এরূপ পরদুঃখে দুঃখী হওয়া, এরূপ পরের

সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করা তাঁর প্রতিদিনের কার্য্য ছিল।

তাঁহার সাধুতা ও সৎকীর্ত্তির বিষয় অনেকে অনেক কথা শুনিয়াছেন, সে বিষয়ে আমি আর অধিক কিছু বলিব না। সে সময়ের একটী ঘটনা বিশেষ ভাবে স্মরণ আছে তাহা উল্লেখ করিতেছি। আমি যখন কলিকাতাতে ফিরিব, তখন একদিন গিরিশবাবুর সহিত নৌকা করিতে গেলাম। বন্ধুরা অগ্রেই বলিয়া দিয়াছিলেন মুসলমান মাঝীর নৌকা অপেক্ষা হিন্দু মাঝীর নৌকাতেই যাওয়া ভাল, কারণ তাহাদের নৌকাগুলি ভাল এবং তারা পাকা মাঝী। এই উপদেশ অনুসারে আমরা নৌকা ঘাটে গিয়া হিন্দু-মাঝীদের নৌকার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিতে লাগিলাম যে কোনও মাঝীই আমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে প্রস্তুত নয়। অবশেষে একজন মঝী চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া আমাকে ডাকিয়া গিরিশ বাবুর নিকট হইতে একটু দূরে লইয়া গেল এবং চুপে চুপে বলিল "মশাই, গিরিশ বাবুর সঙ্গে নৌকা কর্‌তে এসেছেন কেন? আপনাকে কেউ নেবে না, আপনি কোথায় আছেন বলে যান, আমি কাল সকালে আপনার কাছে আসব ও আমি আপনাকে নিয়ে যাব।" আমি বলিলাম—"সে কি? গিরিশবাবুর সঙ্গে এসেছি বলে আপত্তি কেন? ওঁকেত তোমরা জান?" সে বলিল "জানি বৈ কি মশাই, উনিত

একজন সাধুপুরুষ, ওঁর মত মানুষ কটা পাওয়া যায়, উনি গরিব দুঃখীর মা বাপ"। আমি বলিলাম "তবে ওঁর সঙ্গে এসেছি বলে কেন মাঝীরা আমাকে নিতে চাহে না?" সে বলিল—"গিরিশ বাবু জাত মানেন না, যার তার সঙ্গে খান, মুসলমান মাঝীদের রান্না খান, মুসলমান মাঝীর নৌকা পেলে হিন্দু মাঝীর নৌকাতে উঠ্‌তে চান না, তাই ওঁকে কোনও হিন্দুমাঝী নৌকাতে নিতে চায় না। ওর সঙ্গে আপনি এসেছেন ব'লে মাঝীরা ভাব্‌ছে আপনিও বুঝি ঐ তন্ত্রের লোক।" আমি বলিলাম "আমি ঐ তন্ত্রের লোক ত বটে, তবে গিরিশ বাবু আমার সঙ্গে যাবেন না।" সে বলিল "তা হোক আপনাকে আর এক ঘাট থেকে তুলে নিয়ে যাব, কেউত আর দেখ্‌তে আসবে না কে যাচ্ছে।" তৎপর দিন সে ব্যক্তি আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল। গিরিশ বাবুর প্রতি সেই মাঝীর উচ্চভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

বরিশাল জেলাস্কুলে কর্ম্ম লইবার পূর্ব্বে তিনি বরিশালের মাজিষ্ট্রেট সুপ্রসিদ্ধ বেভেরিজ সাহেবের অধীনে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিরূপে একবার তাঁর প্রদত্ত হিসাবের প্রতি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করাতে তিনি সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কিরূপে কিছুদিন পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বেভেরিজ মহোদয় গিরিশ বাবুর নিকট মাপ চাহিয়াছিলেন, তাহাও সেখানে শুনিলাম।

এবিষয়ও অনেকে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। তৎপরে গিরিশবাবু ঢাকাতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি সেখানে গিয়া তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কার্য্য দেখিয়াছিলাম। তাঁহাদের উভয়ের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ঢাকার বন্ধুগণের ধর্ম্মজীবন কিরূপ সবল হইতেছে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। অকপট চিত্তে ও সম্পূর্ণ হৃদয়ে যাঁহারা ঈশ্বর চরণে আপনাদিগকে অর্পণ করেন, ক্ষতি লাভ ও ফলাফল বিচার শূন্য হইয়া যাঁহারা ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে সেবা করেন, একমতি একগতি হইয়া যাঁহারা ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের জীবনের প্রভাব কিরূপ আশ্চর্য্যরূপে শত শত হৃদয়ে কার্য্য করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার পত্নীর জীবনে তাহার আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে শক্তির প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, এই রকম মানুষ দিয়াই সেই শক্তি গঠিত হইয়াছে। অপমান, নির্য্যাতন, অপবাদ, লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের চরণে আমি প্রণাম করি। ঈশ্বরের চরণাশ্রিত এই দাসগণ তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া সেই নিশান ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বীরত্বের দান ফলিবেই ফলিবে। গিরিশচন্দ্র মজুমদার এই দাসদিগের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

আজ তাঁহার স্বর্গগত আত্মা তাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও তপস্যার ফল লাভ করিতেছে, তাহাতে কি সন্দেহ করি! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দৌহিত্র শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্র সরকার এম-এ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত—

"স্মরণ।"

জীবনের আলো, আনন্দে, মৃত্যুর ছায়া, শোক, ত' ছবির আলো-ছায়ার মত মেশান';—সাদা কালো রং না দেখে চিত্রকরের ভাব ক'জন দেখ্তে পারেন?—আমার দাদামহাশয় পার্‌তেন।

প্রিয়জন প্রবাসী হ'লে বিদেশ মধুর হয়, দূর কাছে আসে;—পরপারে গেলে সে অজানা দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়;—বিচ্ছেদকে এমন ক'রে ক'জন দেখেন? —আমার দাদামহাশয় দেখ্‌তেন।

সরোবরে পদ্মকলি জেগে ওঠে, ফোটে, ঝ'রে যায়; তার ফোটায় ও ঝরায় সে সরোবরেই থাকে। জলেতে হাওয়া লেগে ঢেউ ওঠে, বিলীন হয়; কিন্তু জলও ঢেউ নয়, ঢেউও জল নয়।—মানবজীবনকে ক'জন এভাবে বোঝেন? —আমার দাদামহাশয় বুঝ্‌তেন।

আজ তাঁর আশীর্ব্বাদে আমরা ছায়া দেখ্‌ব না, বিচ্ছেদ মান্‌ব না, স্বীকার কর্‌ব তিনি "হ'ন নি হারা"। তিনি

যেমন তাঁর ছোটছেলের মৃত্যুতে অটল বিশ্বাসে বলেছিলেন, "আজ আমার আনন্দের দিন,"—তেমনি ক'রে যেন বল্‌তে পারি।

জীবনে হর্ষে উৎফুল্ল হওয়া, মরণে শোকে অবসন্ন হওয়া ত আমাদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা; কিন্তু জীবনের দায়িত্বে হর্ষ, ও মৃত্যুর মহত্ত্বে শোক, সম্বৃত হ'য়ে আসে; —আজ আমরা মৃত্যুর মহত্ত্ব ও গৌরব স্মরণ করি। দাদামহাশয় বল্‌তেন, "দুঃখ তামসিক, সুখ রাজসিক, কিন্তু শান্তি সাত্ত্বিক"; তাঁর শান্ত আত্মার স্মরণে আমরা শান্তি লাভ করি।

স্মরণ ছাড়া আর আমাদের কি সম্বল আছে? নামে যেমন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, প্রিয়জনকেও তেমনি স্মরণে পাওয়া যায়; ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেলে যেমন তার গন্ধে নিগূঢ়তর অনুভব পাই, ভস্মাবশেষ প্রিয়জনের জীবন-স্মৃতিতে, জীবনে যত কাছে না পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশী ক'রে, অন্তরে অনুভব করি।

প্রথম যৌবনে যিনি বিশ্বাস ও সত্যের জন্য গৃহ, স্বজন ও সমাজ হ'তে নির্ব্বাসিত হ'য়ে সীতাসমা সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে, বিশ্বে একলা বাহির হ'য়েছিলেন,—সেই রাম-চরিত্রানুসারী পুরুষকে আজ স্মরণ করি। তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করুক।

মিথ্যার মধ্যে সত্য প্রচারের জন্য, দুঃখের মধ্যে

মানবসেবার জন্য, যিনি পৈতৃক ধনসম্পত্তি, মানসম্ভ্রম, ও স্বকীয় শিক্ষালভ্য রাজপদ,—এমন কি অভাবে বন্ধুসমাজের অর্থসাহায্য পর্য্যন্ত সমস্ত বৈষয়িক স্বচ্ছন্দ অস্বীকার ক'রে, আপনার চারিধারে ধর্ম্মোৎসাহ অনুপ্রাণিত ক'রে, কর্ম্ম-ক্ষেত্র গ'ড়ে তুলেছিলেন,—সেই বুদ্ধদেবের যোগ্য শিষ্যকে স্মরণ করি। তাঁর চরিত্র আমাদের ত্যাগে সম্পন্ন করুক।

সংসারের অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য ক'রে যিনি সকল আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুদেরই আন্তরিক ভালবাস্তেন,—মিত্রের বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে যাঁর বিশ্বজনীন প্রেম আবদ্ধ ছিল না,—দীন, হীন, নীচপ্রকৃতি পতিতের প্রতিও যাঁর প্রাণের টান ছিল,—যাঁর দৈনিক জীবনে, আলাপে, ব্যবহারে, কর্ম্মে St. Paulএর Charity প্রতিভাত হয়েছিল,—সেই যীশুখৃষ্টের পথানুগকে স্মরণ করি। তাঁর চরিত্র আমাদের প্রেমে মধুর করুক।

প্রাচীন ভারতের তাপসের মত, তিনি দারিদ্র্যের সিংহাসনে দৈন্যের কণ্টকমুকুট স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। নৈমিষের ব্রহ্মজ্ঞানীর মত, কর্ম্মাসক্ত না হয়ে, কর্ম্মকে পূজাজ্ঞানে, কর্ম্মযোগী হ'য়েছিলেন।

শিখগুরুর মত, বিশ্বাসে নির্ভীক হ'য়ে, কর্ত্তব্যসাধনে নির্ম্মম হ'য়ে, জীবন পথে তিনি অগ্রসর হ'য়েছিলেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের আদর্শের মত, বজ্রাপেক্ষা কঠোর হ'য়েও কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিলেন।

পবিত্র জীবন ছিল তাঁর,—সহজ, অনাড়ম্বর,—Wordsworth এর মত; তাঁরই মত দৈন্যেও মহৎ ভাব পোষণ কর্‌তেন,—গৃহ ও দেবতাকে সংশ্লিষ্ট ব'লেই বুঝ্‌তেন।

আজকালকার সমাজে ধনকুলমানের গর্ব্ব ও বৈষম্যের মধ্যে তিনি সাম্যকেই খাঁটি বলে মানতেন; Burns এর মত, "guinea-stamp"এর মূল্য তিনি বুঝেছিলেন।

তিনি একটা মস্ত কিছু হ'তে পার্‌তেন; কিন্তু ছোট হ'য়ে লোকের নজরের বাহিরে থাকাই তিনি পছন্দ করেছিলেন। তাঁর 'জীবনী' হয়ত লোকে ক্রমে ভুলে যাবে; কিন্তু তাঁর জীবনের এই মহৎ শিক্ষা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে স্থায়ী হ'বে,—যে সংসার যাহাই বলুক্ খাঁটি মানুষ হওয়া যায়। তিনি গিয়াছেন—তাঁর অস্তপ্রভা প্রদীপ্ত আছে।

যখন জীবনে সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্বে মিথ্যার সঙ্গে আপোষ কর্‌তে যাই,—তখন যেন তাঁর কথা মনে পড়ে।

ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দ যখন কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট ক'রে আমাদের সুখপরায়ণ ও স্বার্থপর ক'রে তোলে,—তখন যেন তাঁর কথা মনে হয়।

স্বার্থ, বিদ্বেষ, শত্রুমিত্র-ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, যখন আমাদের জীবন বিষতিক্ত ক'রে দেয়,—তখন যেন তাঁর কথা স্মরণ হয়।

দৈন্যে দারিদ্রে যখন লজ্জা বোধ হয়, বিলাসাড়ম্বরের

আয়োজনে যখন হৃদয়-মনের মহত্ব চাপা পড়ে,—গৃহসংসারের ব্যস্ততা যখন দেবতা হ'তে মন কেড়ে নেয়,—তখন যেন তাঁর কথা মনে আসে।

বিশ্বাস হারিয়ে যখন ভীত হই, শোকার্ত্ত হই,—তখন যেন তাঁর কথা স্মরণ করি।

হে প্রবাসিন্, তুমি আমাদের স্মরণে ফিরিয়া এস। হে প্রয়াত পূর্ব্বপূরুষ, তুমি মৃত্যুতে অমর হও। মাটি-ফুল-পাতায় তোমার দেহ পুনর্জীবিত হো'ক্,—বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিনিচয়ে তোমার প্রাণ পুনর্ভূ হো'ক্। তোমার সন্ততির মধ্য দিয়া তুমি অমর হও; মানব-সমাজের মধ্য দিয়া অমর হও; বিশ্বে ও ব্রহ্মে অমর হও।

হে জীবন-মরণের, সুখ—দুঃখের জ্যোতি-তমসার দেবতা, —মৃত্যু দেখাইয়াছ,—অমৃত দেখাও; শোক দিয়াছ,—শান্তি দাও; "তমসঃ পরস্তাৎ" তোমার জ্যোতিস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি মৃত্যু, তুমি দুঃখ, তুমি অন্ধকার;—এ সবের মধ্যেও তোমার বাহিরে ত' নই। সব বিপরীত, সব দ্বন্দ্ব, তুমি নিজের মধ্যে মিলাইতেছ। আজ তোমার অন্ধকার-প্রকোষ্ঠ খুলে দাও,—যা কিছু হারান' সব তোমার মধ্যে আবার ফিরিয়া পাই। তোমার বিশ্বরূপ একবার দেখাও,—বুঝিতে দাও, "কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।"

প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা সরকার কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ—

পিতার জন্মস্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত বীরতারা নামক গ্রাম। তিনি ইংরেজী ১৮৩৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শৌর্য্য-বীর্য্য-শালী ধন-সম্পত্তি-সম্পন্ন খ্যাতনামা মজুমদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বীরতারা নামটি যেমন সুন্দর গ্রামটিও তেমনই বীরত্বে পূর্ণ ছিল। মজুমদারবংশীয়েরা বরাবর সেই নামেরই উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমার পিতামহ হৃদয়কৃষ্ণ ও পিতামহী দয়াময়ীর পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন পিতামহ হৃদয়কৃষ্ণ মজুমদার অতিশয় বীর্য্যশালী, স্বাধীনচেতা ও উদারপ্রকৃতি ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহী দয়াময়ীও দয়ার আধার, তেজস্বিনী ধর্ম্মপরায়ণা, নারীকুলভূষণ রমণী ছিলেন। আমার পিতা তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান। কিন্তু আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে, আমার পিতাই মধ্যম পুত্র নামে অভিহিত হইতেন।

পিতার শৈশবকালের কথা আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তবে ইহা শুনিয়াছি, অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি ছোট, বড়, উচ্চ, নীচ সকল লোকের সহিতই সমতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখনকার লোকের মনে সামাজিক জাত্যাভিমান ভয়ানক

প্রবল ছিল। এমন কি, উচ্চশ্রেণীয়দিগের পক্ষে চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ছায়াতে পদার্পণ করিলেও স্নান করিতে হইত। কিন্তু পিতা সেই কঠিন সামাজিক শাসন অগ্রাহ্য করিয়া সকলের সহিতই সমধুর সখ্যভাবে আবদ্ধ হইতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কখনও এই উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

পিত্যদেব বাল্যকাল হইতেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সরল ঈশ্বর-প্রেমিক সাধক ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে "স্বভাব দর্শন" নামে একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি একেশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন "স্বভাব দর্শনের" প্রত্যেক কবিতাই প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস পূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার স্বগ্রামে কোন এক স্থানে হরিসংকীর্ত্তন শুনিতে যাইয়া, পিতা দেখিলেন ভ্রান্ত দেশবাসী মনুষ্যকে ঈশ্বরের আসনে স্থান দিয়া পূজা করিতেছে। ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।

"হঠাৎ অদূরে ওকি সুমধুর বোল।
বাজে সংকীর্ত্তনে বুঝি চৈতন্যের খোল॥
মরিরে ভক্তের কিবা আনন্দ বিশাল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, করে দেয় তাল॥

গৌরাঙ্গ বলিয়া রঙ্গে ধূলা মাখে গায়।
কালী বলে ভক্তি ভাবে ধরণী লোটায়॥
ভাবি মনে কালী নাম করিয়া শ্রবণ।
বৈষ্ণব কীর্ত্তনে কেন শাক্তের ভজন॥
শুনিনু ভক্তের পাশে কিমাশ্চর্য্য শেষে।
বিরাজেন কৃষ্ণ "কালী" বেশে এই দেশে॥
শ্রবণে ভক্তের হেন অদ্ভুত উত্তর।
হইল বিরক্ত মম তাপিত অন্তর॥
বলিনু হে ভ্রান্ত! হায় একি তব রীত।
যাদুকরে বিভু বলা হয় কি উচিত॥
যে বিভু করেছে সৃষ্টি জগত সংসার।
বাজীকর কভু নহে সমান তাহার
অতএব কুসংস্কার করিয়া বর্জ্জন।
ভক্তি ভাবে প্রাণেশের লওরে স্মরণ॥
জ্ঞান উদ্দীপনে কর কলুষ নাশন।
যতনে বিভুর আজ্ঞা করহ পালন॥"

পিতৃদেব বাল্যকাল হইতেই স্বার্থত্যাগী, হিংসাদ্বেষ-শূন্য মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না। এখানে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। এই কবিতার উচ্চ ও মহৎ ভাব তিনি চিরদিন সম্পূর্ণ-ভাবে নিজ জীবনে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

"কটিতে বসন কসা করেতে কুঠার।
করিছে সুতার ওই তরুর সংহার॥
কুঞ্চিত নাসিকা মুখ বিকট দেখিতে।
উড্ডীন পাদপ খণ্ড আঘাতে আঘাতে॥
কিন্তু মহীরুহ তবু প্রকাশে না বল।
ছায়াদানে অঙ্গ তার করে সুশীতল॥
দুলিছে শাখিনী অগ্র মন্দ মন্দ বায়।
বোধ হয় যেন তারে চামর ঢুলায়॥
হে তরো! করিয়া তব ভাব বিলোকন।
করিনু শিক্ষক পদে তোমাকে বরণ॥
অদ্য হ'তে এই আমি করিলাম সার।
করিব শত্রুর সনে মিত্র ব্যবহার॥
যদি মোরে রোষে কেহ করে কটুত্তর।
সুমিষ্ট বচনে তার তুষিব অন্তর॥
যদি কেহ তুচ্ছ জ্ঞানে করে অপমান।
সমাদরে আমি তার বাড়াইব মান॥
যদি কেহ করে মোর শরীর পীড়ন।
সখা সম্বোধনে তার দিব আলিঙ্গন॥
যদি কেহ চাহে মোরে করিতে সংহার।
আমি দিব গলে তার বন্ধুতার হার॥
ইথে যদি কেহ মোরে বলয়ে বাতুল।
বাতুল কে আছে বল তার সমতুল॥

যে হিংসে আমারে, যদি করি তারে দ্বেষ।
তবে কি আমায় তাতে ইতর বিশেষ॥
যদি যে জিজ্ঞাসে মোরে এ কেমন ভাব।
নির্দ্দেশ করিব বৃক্ষ তোমার স্বভাব॥
ইথে যদি হেসে মোরে অবোধ সে কয়।
নিশ্চয় অবোধ সেই সুবোধ ত নয়॥
অধম হইতে সদা জ্ঞানী লভে জ্ঞান।
সলিল মিশ্রিত দুগ্ধ হংস করে পান॥"

পাঠ্যাবস্থায় পিতার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র স্খলিত ছিল, কিন্তু সেই বীরহৃদয় তাহাদের সহস্র প্ররোচনায়ও কখনও প্রলুব্ধ হয় নাই। যখনই তাহারা কুপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিত, তখনই তিনি বজ্রগম্ভীররবে বলিতেন, "আমার ন্যায় শারীরিক শক্তি তোমার আছে কি? আমাকে বিপথে লইবার চেষ্টা বৃথা। তোমরা যে পথ অবলম্বন করিতেছ, তাহাতে মঙ্গল নাই। আমার কথা শুনিলেনা, যাও! পাপের কষাঘাতে দারুণ আঘাত পাইয়া যখন আবার ফিরিয়া আসিবে, তখনই আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইব। কাহাকেও ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিব না।"

"পাপকে ঘৃণা করিবে কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।" এই মহৎ বাক্যটি পিতা জীবনে চিরকাল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

কলেজে অধ্যায়ন করিবার সময় হইতেই পিতা ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। আমিষ পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হই-লেন। পিতা নিরামিষভোজী হওয়াতে, পিতামহী ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ বলিলেন, "তুমি এই জন্য কাঁদিতেছ? ছেলে যে বিবাহ করিতে চায় না তার উপায় কি? শেষে কি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে?" ইহার পর পিতামহী, জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য প্রভৃতি সকলে মিলিয়া পিতার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পিতাও কিছুতেই বিবাহ করিবেন না, তাঁহারাও ছাড়িবেন না। এই সময় পিতৃদেব ভাবে বিভোর হইয়া কেবলই বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিবাহ করিবেন কি না, এই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎপরে অনেক চিন্তার পর বিবাহে সম্মত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবারস্থ সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে বিবাহের মন্ত্র ছাড়া আর কোন প্রকার পূজা ও স্ত্রী-আচার প্রভৃতি হইতে পারিবে না। বিবাহের দুই তিন মাস পরেই পিতৃদেব প্রাকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলেন। কয়েক বৎসর পরে আমার মাতাকেও লইয়া আসিলেন।

তাঁহাদের গৃহ হইতে বিদায়কালীন যে গভীর বেদনা-ব্যঞ্জক ঘটনার কথা আমরা মাতৃদেবীর নিকট শুনিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। তখনকার লোক

ব্রাহ্ম বলিয়া কিছুই জানিতেন না। খৃষ্টান কিংবা সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া, ইহাই তাঁহাদের ধারণার মধ্যে ছিল। পিতা বিদায় লইতে অগ্রসর হইলে, পিতামহী ও পরিবারস্থ সকলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতামহী পিতৃদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, প্রসন্নের যে রকম ভাব দেখিতেছি, উহাকেও, ধরিয়া রখিতে পারিব না। প্রসন্নকে আমি তোমার হাতেই দিলাম। তুমি উহাকে রক্ষা করিও।" গ্রামবাসী সকলে হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে চলিয়াছে।" পিতামহের নিকট ইপস্থিত হইলে, প্রথমে তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। পিতৃদেব বলিলেম, "জানি আপনার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। তাই আমার সঙ্গে কথা বলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমি নিরুপায়। আপনি আমার পিতা, আপনা হইতে এই দেহ পাইয়াছি, আপনি যদি বলেন, তবে আমি আমার এই শরীরের যে কোন স্থান ক্ষত করিয়া, রক্ত দ্বারা আপনার চরণ ধৌত করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমার এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

তখন পিতামহ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত এই কুসংস্কারপূর্ণ সমাজে ডুবিয়া রহিয়াছি। কুসংস্কার আমার মজ্জাগত হইয়াছে। সমাজ ত্যাগ করিয়া তোমার ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। তোমার ধর্ম্মই সারধর্ম্ম। তুমি যে পথ ধরিয়াছ,

তাহাই ঠিক পথ। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে সিদ্ধি লাভ কর।"

পিতৃদেব সমাজচ্যুত হইয়াও কুসংস্কারের সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিলেন। বাল্যাবধি তিনি ধনে জনে পরিপূর্ণ সুখের সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সেই সুখ ও ধন-সম্পত্তি সমস্ত বর্জ্জন করিয়া একবারে নিঃসম্বল অবস্থায় মাতৃদেবী ও কনিষ্ঠ সহোদরকে লইয়া বরিশালে আসিলেন। তখন খ্যাতনামা পরলোকগত পূজনীয় দুর্গমোহন দাস, সর্ব্বানন্দ দাস, অন্নদা খাস্তগির প্রভৃতি মহোদয়গণ বরিশালেই অবস্থিতি করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তাঁহাদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা যারপর নাই প্রসংশনীয় ছিল। পিতৃদেব বরিশালে আসিলে পর, অবিলম্বেই তাঁহাদের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সে পবিত্র বন্ধন কোন দিনও ছিন্ন হয় নাই। কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থানান্তরিত হইলেও, তাঁহারা আজীবন সেই একই ভাবে পিতাকে ভালবাসিয়াছেন।

ঈশ্বরের করুণার উপর তাঁহার কি দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, নিম্নের ঘটনাটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বরিশালে অবস্থানকালে একদিন দুর্গামোহন বাবু আমাদের পারিবারিক অসচ্ছলতার কথা ভাবিয়া, পিতৃদেবকে

লাইফ ইনসিওর করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন এবং তাহাতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা নিজেই দিবার প্রস্তাব করেন। পিতা বলিলেন, "দুর্গামোহন, আমার ছেলেমেয়েদের জন্য আমি কখনও ভাবি নাই। তাহাই যদি ভাবিতাম, তবে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। ভগবান যাহাদিগকে দিয়াছেন, তিনিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। সে জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তা করি না। আমার জীবন বীমার জন্য যে টাকা তুমি দিতে চাহিতেছ তাহা ব্রাহ্মসমাজের কোন সৎকার্য্যে দান কর, তাহাতে আমি অধিকতর প্রীতিলাভ করিব।"

সেই সময় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। সমাজ হইতে পিতাকে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে দিবার ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু এই সামান্য টাকাও তিনি নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেন না। সেই অল্প আয় হইতে আবার কনিষ্ঠ পিতৃব্যের ডাক্তারি শিক্ষার ব্যয় বাবদ কলিকাতায় কিছু কিছু পাঠাইতে হইত। আমার মাতৃ-দেবীও সম্পত্তিশালী ধনীর গৃহে সুখে ও আদরে পালিতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে পিতার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়া আমার মাতৃদেবী এই সামান্য আয় অবলম্বন করিয়াই আমাদের দরিদ্র সংসারকে সুখের আলয় করিয়া তুলিলেন।

আজ আমার শৈশবের কথা বড়ই মনে পড়িতেছে। পুরাকালের মুনি ঋষিদের আশ্রমের কথা শুনিয়াছি।

আশ্রমবাসিগণ কি অনুপম সুখ, শান্তি ও আনন্দেই বাস করিতেন। বাল্যকালে আমরাও ঠিক যেন সেই রকম ঋষির আশ্রমে বাস করিতাম। আশ্রমের ন্যায় আমাদের গৃহেও অতিথি এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের উপযুক্ত সেবা ও আদর যত্ন ছিল। পিতা স্বহস্তে বাজার হইতে যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী বহন করিয়া আনিতেন, মাতা রন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া, অতিথিগণকে ও আমাদের সকলকে সমান ভাগে সেই সকল খাদ্য সামগ্রী ভাগ করিয়া দিয়া আনন্দলাভ করিতেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী, নির্ভরশীল মাতাপিতার মুখে আমরা সর্ব্বদাই আনন্দের হাসি দেখিয়াছি। আমাদের সেই ক্ষুদ্র আশ্রমটি ধর্ম্মালোচনার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। যে কেহ আধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইতেন, পিতা তাঁহাকেই সাদরে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে বসিতেন।

আপন পর ভেদজ্ঞান তাঁহাতে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বাল্যকালে যখনই পিতামহী তাঁহাকে কোন খাদ্য সামগ্রী দিতেন, তখনই তিনি ছুটিয়া গিয়া ধোপাবন্ধুকে উহার বেশী অংশ দিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেন। তাঁহার বাল্যজীবনের এই মধুর ভাবটি আমরা চিরকাল একই ভাবে দেখিয়াছি। আমাদের গৃহে যখন যাহা প্রস্তুত হইত, চাকর চাকরাণী হইতে পরিবারস্থ সকলকে সমান ভাগ করিয়া খাওয়াইতেন। যদি কোন দিন কোন জিনিস কাহারও ভাগে কম পড়িত

তবে পিতা সেদিন সেই জিনিষটি আহার করিতেন না। খাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, অত্যন্ত কষ্ট ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন।

পিতার দৈনিক কার্য্যের মধ্যে রোগীর সেবা, স্ত্রীলোক-দিগের শিক্ষাদান, সমাজে আচার্য্যের কার্য্য পরিচালন এবং ব্রাহ্মদিগের গৃহে পারিবারিক উপাসনাই প্রধান ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি গৃহের সমস্ত কার্য্যই করিতেন।

পিতৃদেব যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তখন ব্রাহ্মমহিলাগণের অনেকেই লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না। তিনি নিজ হস্তে তাঁহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন এবং অক্ষর পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেককেই বেশ সুশিক্ষা দান করিলেন। কেবল জ্ঞান শিক্ষা দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাহাতে তাঁহারা ধর্ম্ম ও সঙ্গীত বিদ্যায় উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন, সে বিষয়েও পিতা যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

মহিলাগণকে শিক্ষা দিয়া তিনি কখনও অর্থগ্রহণ করিতেন না। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেক অবস্থাপন্ন বন্ধু আপন আপন পরিবারস্থ মহিলাগণের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া পারি-শ্রমিক স্বরূপ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য কত সময় তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিজ্ঞা আজীবন অটল ছিল। শুধু এই বিষয়ে কেন,

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর হইতে কি ধর্ম্মসংস্কার, কি সমাজসংস্কার কোন বিষয়ই তিনি আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। একই ভাবে চির জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

পিতৃদেব রোগীর সেবা শুশ্রূষা, ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন এবং এই মহৎ কার্য্যে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে যেরূপ প্রভূত শক্তি ছিল মনেও তেমনই অসাধারণ বল ছিল। আমরা কত সময় দেখিয়াছি, পিতা মাসাধিককাল ব্যাপিয়া সংক্রামক রোগীর নিকট অক্লান্ত মনে বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেছেন ও ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইতেছেন। সেই সকল সংক্রামক রোগীর মৃতদেহ বহন করিবার জন্য লোক পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত, কিন্তু পিতা অনেক সময় একাকীই তাহাদের সৎকার করিয়া আসিতেন। তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বরিশালের সেবাসমিতি ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে।

পিতৃদেবের ভগবৎ-প্রেম-বিগলিত উপাসনা ও উপদেশ প্রাণে যে কি স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। তখন তাঁহার সেই উজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এক সময়ে আমাদের এক পরম বন্ধু অত্যন্ত ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন। একদিন সমাজ মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে কৌতূহলী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেই

সময় পিতৃদেব আচার্য্যের কার্য্য করিতে ছিলেন। পিতার সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ও হৃদয়গ্রাহী উপাসনা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল; তিনি অচিরে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া পড়িলেন। এই প্রকার কত ব্রাহ্মবিদ্বেষী ব্যক্তি যে পিতার জীবন্ত উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া উপকৃত হইয়াছেন এবং বিদ্বেষশূন্য হইয়া মহৎ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন।

পিতৃদেব যখন নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইতেন, তাঁহার তখনকার সেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা ভাব দেখিয়া বিদ্বেষীরাও তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতেন। চৈতন্য-দেবের সংকীর্ত্তনের কথা শুনিয়াছি। শ্রীচৈতন্য যেরূপ ভাবে বিগলিত হইয়া, দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিতেন, আমার পিতাকেও ঠিক সেইরূপ ভাবে সংকীর্ত্তনে মাতিয়া বিগলিত হৃদয়ে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। সে উজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি এখনও যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে।

পিতৃদেব সর্ব্ববিধ জ্ঞানের আকর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমাদের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষৎ ও সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি নিয়মিত রূপে পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। একবার যাহা অধ্যয়ন

করিতেন তাহা খোদিত অক্ষরের ন্যায় চিরস্থায়ী রূপে তাঁহার স্মৃতির মধ্যে মুদ্রিত হইয়া থাকিত। পঠিত পুস্তকের যে কোন স্থান হইতে প্রশ্ন করিলে তিনি আনন্দের সহিত সুললিত ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন।

তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তবে সৎকার্য্যে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন, ইহাই তিনি ভালবাসিতেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১১ই মাঘের উৎসবোপলক্ষে আমার মাতৃদেবীকে তিনি প্রকাশ্য ভাবে বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। সেই সময়ে পিতার পরম বন্ধু পরলোকগত, স্বাধীনচেতা, ধর্ম্মপরায়ণ, শ্রদ্ধাস্পদ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় বরিশালে মুন্সেফের কার্য্য করিতেন। তিনি এই সৎকার্য্যের প্রধান সহায় ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সহরময় তীব্র প্রতিবাদ চলিয়াছিল, মাতৃদেবী পরদার অন্তরালে থাকিয়া বেদীর কার্য্য করেন, অনেকেরই এইরূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতা দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন "এই রকমে পরদার অন্তরালে থাকিয়া ভগবানের পূজা করা হয়, ইহা আমার অভিমত নহে, ইহাতে পবিত্র কার্য্যের অবমাননা হয়। এই জন্য পরিণামে তোমরা উন্নত সমাজে নিন্দনীয় হইবে।" এই বলিয়া উৎসাহবাক্য দ্বারা সকলের ভীরুতা দূর করিয়া তিনি আপনার নির্ভীকতার পরিচয় দিলেন।

পিতৃদেব প্রেমের অবতার ছিলেন। ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, পাপী তাপী, যে কেহ নিকটে আসিত, তাহাকেই তিনি হাসিতে হাসিতে প্রেমে আলিঙ্গন করিতেন। প্রেমের যিনি একমাত্র উৎস, সেই প্রেমময়ের প্রেমে সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিভোর থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরের উপাসনার কি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে? তাঁহার উপাসনা সমস্ত সময়ই করিতে পারা যায়।" সেই দেবচরিত্র পিতার এই উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।

পিতৃগৃহ প্রত্যেক সন্তানের পক্ষেই অতি সুখের ও শান্তির স্থান। কিন্তু আমাদের ঋষিতুল্য পিতার প্রাণভরা স্নেহ ও ভালবাসা আমরা যেমন পাইয়াছি, সে রকম অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। শুধু আমরা কেন, যে কেহ তাঁহার ভালবাসার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, এরূপ অকপট হৃদয়ের সরল ভালবাসা জগতে নিতান্তই বিরল। তাঁহার অতুল স্নেহে আমরা যে কি সুখে ছিলাম, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আজ বিবিধ সাংসারিক সুখসৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াও আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গের সুখ ও আনন্দ আর পাইতেছি না। এমন পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা তাঁহার দেব-চরিত্রের কিছুই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ পিতার সন্তান বলিয়া পরিচয়

দিতে আজ লজ্জাবোধ করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই, আমরা যেন জীবন-পথে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিতে এবং তাঁহার সন্তান নামের উপযুক্ত হইতে পারি। তুচ্ছ ধন দৌলতের পরিবর্ত্তে তিনি যে স্বর্গীয় অমূল্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই যেন আমাদের পার্থিব জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়।

হে পরমারাধ্য পিতা, হে গুরো! তুমি একাধারে আমাদের সর্ব্বস্ব ছিলে, এতদিন আমাদের মস্তকের উপর অভয়দাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলে, আজ তুমি কোথায়? ইহ জগতে আর তোমাকে দেখিতে পাইব না, ভাবিয়া আমাদের প্রাণ আকুল হইতেছে। তোমার সেই সুমধুর আশ্বাসপূর্ণ বাক্য আর শুনিব না! আজ এক মাস হইল, আমাদের সব আশা, সব আনন্দ ফুরাইয়া গিয়াছে। তুমি আনন্দের উপাসক ছিলে, আজ তুমি সেই আনন্দের কোলে আনন্দে বিরাজ করিতেছ। তুমি ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও শক্তিতে বীর মহাপুরুষ ছিলে, অমর ধামে যাইবার সময়ও ঠিক বীরের ন্যায় চলিয়া গিয়াছ। হায়! আমি তোমার এমন অধম সন্তান যে অতি নিকটে থাকিয়াও তোমার অন্তর্দ্ধানের সময় তোমাকে দেখিতে পাইলাম না।

হে পিতার পিতা বিশ্বপিতা! আমরা আশ্রয়হীন ও শোকে অভিভূত হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! তুমি আমাদের আশ্রয় হও। এই

শোকের অন্ধকারে তোমার মঙ্গল জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। বিশ্বজননী দয়াময়ী মা, আমার শোকাকুলা জননীকে তুমি সান্ত্বনা দাও। অবিচ্ছেদে ৫১ বৎসর কাল দেবচরিত্র স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া আজ এই নিদারুণ আঘাতে তিনি কি যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাহা তুমি বিশেষরূপে জান! তুমি পতির পতি হইয়া তাঁহাকে শান্তিতে রাখ। তাঁহার শূন্য হৃদয় তোমার করুণার দ্বারা পূর্ণ কর, তোমার নিকট এই আমার কাতর প্রার্থনা।

হে বিশ্বজননি, করুণাময়ি মা! আমার ন্যায় অধম সন্তান সেই পূতচরিত্র পিতৃদেবের অমরাত্মার জন্য কি প্রার্থনা করিতে পারে? ইহজগতে তিনি প্রাণমন দিয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সকল সাধন করিয়া গিয়াছেন, এখন দিব্য-ধামে থাকিয়া আনন্দে তোমার সহবাস সম্ভোগ করিতেছেন। হে পিতার পিতা! আমাদিগকেও তুমি তোমার পথে টানিয়া লও। সংসারে আসক্ত হইয়া আর যেন তোমাকে ভুলিয়া থাকি না। তোমার সেই প্রিয় সন্তানের পদানুসরণ করিয়া চলিতে আমাদের শক্তি দাও। তাঁহার দেবচরিত্র উজ্জ্বল আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা যেন পার্থিব জীবনযাপন করিতে পারি। হে প্রভো, তোমার নিকট এই আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা। এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর।

তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রমিলা দেবী কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত প্রার্থনা ঃ—

হে মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি আমাদের জন্য যাহা বিধান করিয়াছ এবং যাহা করিতেছ ও করিবে সবই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আমরা তোমার অবিশ্বাসী সন্তান, মুখে বলি তুমি মঙ্গলময়, কিন্তু তুমি যে সকল কার্য্য করিতেছ তাহাতে আমাদের একটু দুঃখ হইলেই আমরা অধীর হই। আমরা যদি জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেখি তবেই তোমার প্রত্যেক কার্য্যে তোমার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, মিলনের পর বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের পর মিলন সর্ব্বদাই হইতেছে, তবু আমরা দেখিয়াও দেখিনা। যেমন পৃথিবীতে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে আলোক ও অন্ধকারের বিভিন্নতা দেখাইতেছ, সেইরূপ সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিয়াও আমাদিগকে সুখ দুঃখের বিভিন্নতা দেখাইতেছ। কৃষ্ণপক্ষ না থাকিলে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুন্দর দৃশ্য যে কত সুখকর তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। সুতরাং আমরা তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করিলেই সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মিলনে বিচ্ছেদে সর্ব্বক্ষণই তোমার মঙ্গলহস্ত দেখিয়া পুলকিত থাকিতে পারি। তুমি আমাদের পিতাকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া নিয়াছ, যদি আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই পিতার জন্য শোক করিবনা।

তাঁর পৃথিবীর কাজ ফুরাইয়াছে, তাই তিনি তোমার ডাক শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সাধুপুরুষ ছিলেন, তিনি তোমার ভক্ত সন্তান, তাই তোমার ডাক শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর জীবনে তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন, তুমি তোমার প্রিয় সন্তানকে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য পাঠাইয়া ছিলে, তিনি তোমার প্রকৃত বাধ্য সন্তান ছিলেন, তাই তোমার আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুখী হইতেন। কত কুপথগামী লোক তাঁর সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার দিকে ধাবিত হইয়াছে। আমরা সেই পিতাকে এখন হারাইয়াছি, আর এ পৃথিবীতে তাঁর উপদেশ শুনিব না, তাঁর ভালবাসা পাইব না, কিন্তু তুমি সেই পিতার পিতা পরম পিতা, তুমি তো সেই একই ভাবে আছ। আমরা যাহাতে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পাই, যাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে তোমার আদেশ ও উপদেশ শুনিতে পাই, তুমি আমাদিগকে সেই জ্ঞান দান কর, তবেই আমরা পিতার শোক সম্বরণ করিতে পারিব। তুমি অমৃতময়, এই কথাটী আমরা যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, যাহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি আমাদের পিতা এখন শান্তিনিকেতনে অমৃতময়ের ক্রোড়ে, তুমি আমাদিগকে সেই শিক্ষা দাও। ইহলোক এবং পরলোকে কি

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা যাহাতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি সেই শক্তি আমাদিগকে প্রদান কর।

আমাদের জননী এখন বড়ই শোকাকুলা, বালিকা বয়স হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যে সঙ্গীর সহিত বাস করিতেছিলেন, যে সঙ্গী সংসার ক্ষেত্রে তাঁর ধর্ম্মপথের চালক ছিলেন, তিনি আজ তাঁহাকে ফেলিয়া পরলোকে গিয়াছেন, এখন তাঁর পক্ষে এই বিচ্ছেদ তীব্র যাতনা দায়ক। তুমি শান্তিময়, তুমি মঙ্গলময়, তুমি যে এই বিচ্ছেদ মঙ্গলের জন্য করিয়াছ এই কথা তুমিই আমাদের মাতাকে বুঝাইতে পারিবে। এই বিচ্ছেদ দ্বারা তিনি তোমার পানে বেশী অগ্রসর হইবেন এইকথা তুমিই তাঁকে বুঝাইতে পারিবে। তাঁর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তুমিই শান্তিদান করিবে। তাই ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাঁর হৃদয়ে শান্তিদান কর।

হে প্রেমময়, তুমি যে সকলকে সর্ব্বদা প্রেমকর তাহা বিশ্বাস করি, আমরা সাধু হই আর অসাধু, হই তুমি আমাদের সব দোষ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিবেই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পিতাকে তুমি তোমার অমৃতক্রোড়ে স্থান দিয়াছ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক সুখে রাখিয়াছ; কিন্তু আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাহা জানিয়াও তাঁর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি প্রেমময়, তুমিই শোক তাপহারী,

এই আমরা যেন সর্ব্বদা মনে করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

বাবা, আজ তুমি কোথায়? তোমার কাছে শুনিয়াছি পরলোকে পাপ নাই, দুঃখ নাই, তুমি এখন সেই নিষ্কলঙ্ক আনন্দধামে বাস করিতেছ। তোমার নিকট অনেক ভাল কথা শুনিয়াছি, অনেক সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার সন্তানের যোগ্য হইতে পারি নাই। তুমি মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে থাকিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মপথে নিতে পার নাই, ঈশ্বরের সেবক করিতে পারে নাই, আজ তুমি মনুষ্যদেহে নাই, আজ সর্ব্বশক্তিমানের সহিত মিলিত হইয়াছ, আজ সেই সর্ব্বশক্তিমানের ভিতর দিয়া তোমার আদেশ ও ইচ্ছা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করুক, আমরা প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হই। আমরা তোমাকে এখন আর মনুষ্যরূপে দেখিতে পাই না, তাই আমরা একেবারে অস্থির হইতেছি। এখন আমাদের শিশুজীবন হইতে এ পর্য্যন্ত যত কিছু ঘটনা অর্থাৎ তোমার যত উপদেশ ও দৃষ্টান্ত ও কার্য্য সবই মনে পড়িতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ভিতরেও তুমি কেমন নূতন নূতন শিক্ষা দিতে তাহাও মনে পড়িতেছে। তুমি আজ আর এ পৃথিবীতে নাই তাই আমরা মনে করিতেছি তুমি নাই। তুমি এখানে নাই বটে কিন্তু তুমিত আছ। তোমার অমর আত্মা অমরধামে আছে, তোমার অমর কীর্ত্তিসকল পৃথিবীতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে আমরা মনুষ্যরূপ

শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছি, শরীর নিয়া আমাদের এখানকার সম্বন্ধ, তাই শরীর না থাকিলেই আমরা একেবারে হতাশ হইয়া যাই। আমরা মনে করি আমাদের বিনাশ হইল। ঈশ্বরের রাজ্যে বাস্তবিক কিছুরই বিনাশ নাই, ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না। তোমার শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া শোক করি, কিন্তু তাহারও বিনাশ হয় নাই, পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীতেই আছে, এবং অমর আত্মা অমর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা তোমার মত হই নাই, তাই তুমি যেমন ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে আমরা তেমন বুঝিতে পারি না। আমরা স্বার্থান্ধ তাই শোক করি। তুমি আজ অমৃতময়ের ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কত সুখী, পিতা মাতা ও ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কত সুখী। তুমি যে তোমার কীর্ত্তি পৃথিবীর স্থানে স্থানে ছড়াইয়া রাখিয়াছ, তাহাই আমরা যথেষ্ট মনে করিয়া সুখী হইতে পারি না, ইহাই আমাদের স্বার্থপরতা। তোমার যতদিন পৃথিবীতে কার্য্য ছিল করিয়াছ, যাইবার সময় হইয়াছে, ডাক শুনিয়াছ, তাই গিয়াছ, একথা আমাদের মনে করা কর্ত্তব্য। তুমি পৃথিবীতে নাই, কিন্তু তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিয়া আছে। তোমার ভালবাসা এবং উপদেশ সর্ব্বদাই পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন তুমি যে আমাদের কাছে নাই তবুও যেন তোমার আদেশবাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ

করে। আমরা যেন সর্ব্বদা মনে করিয়া সুখী হইতে পারি যে আমাদের বাবা তাঁর বাড়ীতে গিয়াছেন এবং আমাদের যখন যাওয়ার সময় হইবে তখন তিনি পথ দেখাইয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। বাব', তোমার যাইবার সময় তোমাকে আমি দেখিতে পাই নাই এজন্য সর্ব্বদাই একটা যাতনা অনুভব করিতেছি। তোমার কাজ করিয়া আমি সুখী হইতাম, শিশুকাল হইতে তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করিয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তোমার বৃদ্ধাবস্থায় তোমার সেবা খুবই কম করিয়াছি এবং অন্তিমে কিছুই করিবার সুযোগ হয় নাই। অন্তিমকালে তোমাকে দেখিতেও পাই নাই। এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন সর্ব্বদা তোমাকে চক্ষের সাম্‌নে দেখিতে পাই, সর্ব্বদা তোমার উপদেশ শুনিতে পাই। যেমন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি তোমার উপদেশ মত করিয়া সংসারে জয়লাভ করিতে পারিতেছি, তেমন তোমার উপদেশ দ্বারা যেন ধর্ম্ম-পথেও জয়ী হইতে পারি। তুমি স্বর্গ হইতে তোমার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কর।

হে মঙ্গলময়, তুমি যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। আমরা যে পিতাকে আশ্রয় মনে করিতাম তুমি তাঁহার অপেক্ষাও অনেক দৃঢ় আশ্রয় ইহা বুঝাও। তুমি পিতার পিতা, আশ্রয়ের আশ্রয়, তোমাকে জানিতে আমরা লালায়িত হইনা, এখন এই ঘটনা দ্বারা আমাদিগকে বিশ্বাসী কর এবং

তোমার দিকে টানিয়া লও। পৃথিবীর সুখ অল্পদিনের, তোমাকে লাভ করিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিয়া সুখী হওয়াই প্রকৃত সুখ শান্তি, এই ভাবিতে দাও। আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দাও যেন প্রত্যেক ঘটনাতেই আমরা তোমার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই।

তুমি মঙ্গলময়, তুমি শান্তিময়, তোমাকে নমস্কার করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংবাদপত্রের অভিমত।

BRAHMOISM IN LIFE AND CHARACTER.*

Between liberal views in matters religious and liberal religion embodied in life and character there is a vast difference. Where liberal views falter and fail, a liberal faith stands firm and conquers. Men of liberal views we have in this country by thousands ; but the influence they exert on their immediate surroundings is insignificant. Their neighbours are shrewd enough not to

* The Indian Messenger, Thursday, December 25, 1913.

attach any very great importance to the principles they profess, which they themselves do not care to be guided by in practical life. But, let us gratefully acknowledge, there have been in our midst men who have courageously lived their liberal faith. It is through the influence of these men that Brahmoism has spread. Such a man we have recently lost in the person of Babu Girischandra Majumdar, whose *adya sraddha* was performed in Calcutta last Sunday before a large gathering, Pandit Sivanath Sastri acting as minister.

Girischandra Majumder was born at Birtara in the district of Dacca of a respectable Kayastha family seventy-seven years ago. His English education began at Barisal, where his father Hridaykrishna Majumdar was employed. Girischandra inherited many virtues from his parents who were known to possess many a noble quality of head and heart. He passed his Entrance from the Pogose School, Dacca, with credit and obtained a scholarship and a medal. That the child is father of the man is well illustrated by the following incident of his life. Girischandra and Dinanath Sen were

class-fellows and fast friends. In those days the candidate who produced the best Bengali essay was awarded a gold medal. He and his friend Dinanath having secured equal marks, the question arose as to the way in which the medal was to be disposed of. Generous Girischandra represented to the authorities that he had already obtained a scholarship and a medal and would be glad to see the medal for the best Bengali essay awarded to his friend Dinanath, who was awarded the prize on the withdrawal of Girischandra's claims.

In 1861 Girischandra entered Dacca College. While he was yet a student, the *Tattvabodhini Patrika* of the Calcutta Brahmo Samaj fell into his hands, and the effect it produced on his guileless heart and vigorous mind was remarkable. He embraced the Brahmo faith and threw himself heart and soul into the practice and propagation of it. The bright prospects of a brilliant career could not lure him. He left college and after a short while went to Barisal to take up the work of the Samaj in right earnest. At Barisal he would lead the choir, give readings from scriptures

and often preach. When Calcutta was being agitated by the activities of Keshub Chander Sen, Barisal was feeling the influence of Girischandra's eloquent preaching and religious fervour. By his unblemished life, generous character and ardent reforming zeal he set a noble ideal before the Barisal public. Not a few followed his example and joined the Brahmo Samaj. Testifying to the worth of the man a Brahmo friend writes from Lahore : "At first I was a great hater of Brahmos. One day as I was passing by the Barisal Brahmo Samaj, the deep and sonorous voice of Babu Girischandra Majumdar greeted my ears and I entered the Mandir out of curiosity. But such was the effect produced on my mind by the service and sermon that from that very day my hatred for Brahmos ceased and I became attached to the Brahmo faith."

Grischandra Majumdar had no other ambition than the consecration of his life to the propagation of Brahmoism, and with this end in view he devoted himself to the service of the Brahmo Samaj on a precarious allowance of Rs. 15 a month from the

mission fund. But afterwards at the special request of his dear friend the late Durgamohan Das, who was then a practising lawyer at Barisal, he accepted a post in the local Municipal Office. But it was not long before he gave it up. The District Magistrate questioned the veracity of the humble Municipal employee in a particular matter. Girischandra at once resigned and returned home to tell his wife Manorama Devi that he had no time to consult her in this important matter, as self-respect demanded immediate resignation. After three years Mr. Beveridge found out his mistake and apologised to Girischandra for the injustice he had done. Though requested by the Magistrate to come back, he did not do so.

He was then employed as a teacher in the Barisal Government School, where his pay gradually increased to Rs. 40 only. He was a true example of plain living and high thinking. He gladly shared his humble fare with his guests and dependants, who were all as well cared for as himself. His character was equally ennobled by love of God and love of man. He would sing hymns while sitting by the sick-bed in the

homes of the friendless and the poor. When epidemics of cholera and small-pox raged at Barisal, Girischandra Majumdar was seen wherever help was needed. His friends often became anxious about his own safety, but they dared not dissuade him from his work of ministration. A servant of an orthodox Hindu fellow-townsman having died of cholera, and there being none to take the body to the cremation ground, Girishcandra offered his services and alone carried it over his shoulders to cremate it. Once, as he was tending a poor man suffering from cholera, word was brought to him of his own little boy being suddenly taken ill. He refused to leave the place, saying that while there were many to look after his child, the poor man had none but himself to attend to him. Such was the man of faith and love whom it pleased God to use as his instrument in furthering His cause at Barisal. The one consuming thought of his life was how best he could be faithful to his God. The Inspector of Schools of the Dacca Division, while inspecting the Barisal Government School, one day asked each member of the

school staff what favour he wanted from Government. While others pleaded for increment of pay or transfer, Girischandra said that he had nothing to ask for, and what he was most concerned about was that through God's grace he might faithfully perform the duties he was entrusted with. It was only natural that he should be universally respected at Barisal. Genuine piety is irresistible, and it was so in the case of this man of God. He was laterly transferred to Dacca, where too he served the Brahmo Samaj faithfully and was held in high esteem. Once during a festival of the East Bengal Brahmo Samaj a band of lawless young men took it into their heads to molest the Brahmos during their evening service. Stones and brickbats were being thrown into the mandir. The congregation took alarm and was about to disperse in despair, when Girishcandra arose and offered, in his eloquent language and with his burning enthusiasm, a fervant prayer. The rowdies, charmed, as it were, into quietness, sat down to listen and the proceedings went on unobstructed.

His love for the oppressed and the down-

trodden made him a genuine friend of the woman's cause. His wife, Manorama Devi, was the first Brahmo lady to preach from a Brahmo pulpit. A reformer of the most advanced type, Girischandra Majumdar spent his whole life in the service of man, which he considered to be the service of his Maker. The faithful servant of the Lord has now entered into his well-earned rest, leaving us a noble example of Brahmoism in life and character. May he be a beacon light to us in our endeavours after Brahmo life and character!

সাধু গিরিশচন্দ্র মজুমদার।*

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of Ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air."

"কত নির্ম্মল উজ্জ্বল আভাযুক্ত মণি সমুদ্রের অন্ধকারময় অতলস্পর্শ গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে; কত পুষ্প লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত হইয়া বন্যভূমিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে!"

* "তত্ত্ব-কৌমুদী" হইতে উদ্ধৃত।

সংসারে যুগে যুগে যে সকল মহাত্মা, জ্ঞানী, গুণী, ধার্ম্মিক লোক জন্মগ্রহণ করিয়া মানবমণ্ডলীকে নব অনুপ্রাণনা দিয়া গিয়াছেন, জগতে নূতন যুগের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, লোকে তাঁহাদিগকে জানিয়াছে, তাঁহাদের চরণে ভক্তির পুষ্প উপহার প্রদান করিয়াছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে কত ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী জন্মিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অতি অল্প লোকের ভিতরেই তাঁহাদের জীবনের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, অল্প লোকেই তাঁহাদের জীবনের সুগন্ধে মোহিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, প্রতিবেশীর মধ্যে, জীবনের মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া চলিয়া গিয়ালেন ; বাহিরের লোকে তাঁহাদের কথা বিশেষ জানে নাই। সাধু গিরিশচন্দ্রও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বরিশালে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল; বরিশালের হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান্ সকলেই তাঁহার দেবজীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল ; সকলেই তাঁহাকে ভক্তির অর্ঘ প্রদান করিত ; কিন্তু অন্যত্র লোকে তাঁহাকে বিশেষ জানিত না ; এমন কি, ব্রাহ্মসমাজের লোকেও সকলে তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্যক অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু ঈশ্বরভক্ত তিনি, ঈশ্বরের সেবক তিনি, ব্রহ্মের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, জীবনের কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করিয়া, প্রাণপণে

রোগীর সেবা করিয়া আনন্দ মনে ব্রহ্মধামে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে জানিতেন আজ তাঁহাদের প্রাণে কত বেদনা, যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা বন্ধু ও গুরু হারাইয়া কত ব্যথিত; তিনি স্বর্গলোকে সাধুসাধ্বী নর-নারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন।

* * * * *

গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের কথা আর কি বলিব? ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ ছিল; ধর্ম্মের জন্য তিনি বাঁচিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য মরিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে যখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আরাধনা করিতেন, যখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতেম, তখন তাঁহার দিকে তাকাইলেও লোকের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়া উঠিত। তাঁহার গভীর সাধনা, উন্নত চরিত্র, উজ্জ্বল কর্ত্তব্যজ্ঞান, লোকের সেবা বরিশালবাসীর মনঃপ্রাণ বন্দী করিয়াছিল; যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধী তাঁহারাও গিরিশ বাবুকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন।

এক সময়ে কোন হিন্দু পরিবারের এক যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়; তাঁহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বন্দী করিয়া গৃহে লইয়া যান; ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁহাদের তখন কত বিদ্বেষ ভাব; সেই সময়ে সেই

যুবকের পিতা বলিলেন,—"ব্রাহ্ম হচ্ছিস, ব্রাহ্ম কে আছে? একজন ব্রাহ্ম আছে গিরিশ মজুমদার, আর ছিল সর্ব্বানন্দ দাস।" ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যায় বরিশালের জনসাধারণের গিরিশ বাবুর প্রতি কিরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল।

*   *   *   *   *

তাঁহার সরলতা ও অমায়িক ভাব সকলেরই অনুকরণীয়। যেখানে যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে মনঃপ্রাণ খুলিয়া তাহার সঙ্গেই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম যাঁহার প্রাণে, তাঁহার ব্যবহার ত সরলই হইবে।

ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন; তিনি ব্রাহ্ম হইয়া সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নিজে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন।

*   *   *   *   *

গিরিশচন্দ্র আজ ইহজগতে নাই; কিন্তু তাঁহার পুণ্যময় জীবনের স্মৃতি অনেকের প্রাণে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে অনেকে জানিত না, অনেকে তাঁহার কর্ম্মপ্রাণতা অনুভব করে নাই; কিন্তু যাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনের রক্ত দিয়া ধরিয়াছিলেন, যাঁহারা ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবসেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নীরব সাধনা ব্রাহ্মসমাজকে উন্নত করিয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক করিব না। তিনি ইহলোকের কার্য্য শেষ করিয়া আনন্দে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি লইয়া ব্রাহ্মগণ যদি জীবন উন্নত করিতে পারেন, তাঁহার পূত জীবনের আদর্শ যদি অনুসরণ করিতে পারেন, তবে তাঁহারা ধন্য হইবেন।

These shall resist the empire of decay,
When time is o'er and worlds have passed away,
Cold in the dust, the perished heart may lie,
But that which warmed it once can never die.

পরিশিষ্ট।

আচার্য্য গিরিশচন্দ্র।*

যে সকল শ্রেষ্ঠ ও মনস্বী পুরুষেরা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, যাঁহারা নগরে নগরে ব্রহ্মমন্দির ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন; বিবিধ বিষয়ে মতান্তর সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা এদেশের বহু বিষয়ে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয় সভ্যতা যখন বিদেশীয় শিক্ষা, সংস্কার ও মতের প্রভাবে আপনার প্রকৃত পথ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই, বহু উচ্ছৃঙ্খলা যখন নানা বিষয়ে আবির্ভূত হইতেছিল; তখন দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাজনেরা দেশের হৃদয় ও মনকে বিভ্রান্ত হইতে দেন নাই—মঙ্গলের পথে ধীর ও স্থির গতিতে দেশের উৎসাহ ও শক্তিকে চালিত করিয়াছেন। মত-ভেদ-জনিত বিদ্বেষের ভাব পরিত্যাগ করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে, তাঁহারা

* বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখের স্মৃতিসভায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস মহাশয় প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে তৎ-কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত।

এদেশের কি উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট এদেশের ঋণ অস্বীকার করিবার যো নাই। তাঁহারা দেশের যে হিতসাধন করিয়াছেন, দেশ এখন তাহা পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ করিতেছে; পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেশ দেখিতে পাইবে যে, এই মঙ্গল—এই কল্যাণের মূলে কত নিস্বার্থ পুরুষের আত্মত্যাগ ও স্বার্থ-বিসর্জ্জন রহিয়াছে। কোনও দেশের, কোন সমাজের কল্যাণ সাধনে কাহার কার্য্য কতদূর, তাহার মাত্রা নির্দ্দেশ করা সকল সময় সম্ভব নয়; তবে দেশে যেমন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তেমন আত্মত্যাগী নরনারীরও আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের কর্ম্ম ও জাতীয় জীবনে তাঁহাদের স্থান, দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। মতভেদ ও মতপার্থক্য হেতু, এই সকল কৃতীপুরুষের কর্ম্ম অস্বীকার করিলে, জাতীয় জীবন সংগঠনের পক্ষে নিতান্ত অন্তরায় উপস্থিত হয়। আমরা যাহার জীবনের কথা বলিতে যাইতেছি, এদেশে তাঁহারও তেমন একটা স্থান আছে। তাঁহার কর্ম্ম সুবৃহৎ না হইতে পারে, তাঁহার কর্ম্ম সমস্ত দেশব্যাপী না হইতে পারে, কিন্তু যে আলোক—যে স্রোত সমস্ত দেশের মঙ্গলের জন্য প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম, পুণ্য উৎসাহ, দিব্য সাধনা ও বিসর্জ্জন সেই স্রোতে, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের ভিতর থাকিয়াই, বেগ সঞ্চার করিতেছিল।

বংশ ও ভ্রাতাগণ।

বিক্রমপুরে বীরতারা ভদ্র কায়স্থ গ্রাম। গিরিশচন্দ্র খ্যাতিসম্পন্ন কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা আজ বলিব না। তবে পিতার স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি সামর্থ্য যে পুত্রদিগকে বিশেষ স্বাস্থ্য-সম্পদ দান করিয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য। শারীরিক বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তায় গিরিশচন্দ্রের তিন ভ্রাতা প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিঃস্ব অবস্থায় বলিতেন, "একমাত্র পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছি—এই সুদৃঢ় শরীর।" এরূপ সম্পদ অবশ্য সকলের থাকে না। সন্তানের শরীর-গঠনে পিতা মাতার যে দায়িত্ব, গিরিশচন্দ্রের সবল সুস্থ দেহ মনে হইলে, স্বতঃই সে কথা স্মরণ হয়। তিনি যখন উদর স্ফীত করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, "আমার এই উদর কে টিপিয়া নরম করিতে পার?" আমরা কতবার দেখিয়াছি, সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা কিছুতেই নরম করিতে পারি নাই। শারীরিক সামর্থ্য—জ্ঞান-সাধনা, ধর্ম্ম-সাধনা, মানব-সেবাও মানব-হিতৈষণায় কত প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সেবাব্রতে এই পৈতৃক শরীর-সম্পদ কত সহায় হইয়াছিল! এমন সম্পদের কথা দেশের বর্ত্তমান জনকজননীগণ সতত মনে রাখিলেই আমাদের পরম কল্যাণ। ভ্রাতাদিগের তিনেরই ভিতরে একটা স্বাভাবিক অমায়িকতা বর্ত্তমান ছিল; তাঁহারা একদিকে যেমন ভোজনপটু ছিলেন,

অন্যদিকে তেমনি অতিথি-সৎকারে তাঁহাদের বিশেষ নিপুণতা ও অনুরাগ দৃষ্ট হইত। ডাক্তার প্রসন্নচন্দ্র রসিকতা-পটু, সেবানিরত, বালক-বালিকা-প্রিয়, মহিলাদের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী, ও আশ্চর্য্য সামাজিকতা-নিপুণ ছিলেন। বালক-কালে তাঁহার সেই হাস্যময় নির্দ্দোষ রসিকতাপূর্ণ বাক্যগুলি শুনিয়াছি, আজও তাহা মনে আছে। তিনি গৃহে আসিলে যেমন বালক বালিকা তেমনি মহিলাদের ভিতরে এক মহানন্দ ক্রীড়া করিত। আর মনে পড়ে—সেই দীন-চিত্ত হরিশ্চন্দ্রকে, যিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন; বহু পরিবার-প্রপীড়িত হইলেও যাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। মনে পড়ে—গিরিশচন্দ্রের সেই আনন্দপূর্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি; তিনি রাজপথ অতিক্রম করিবার সময় স্পষ্টই লক্ষিত হইত যেন তাঁহার ভিতরে কি সুর বাজিতেছে! সেই গম্ভীর মূর্ত্তিতে কঠোরতা বা শাসনের ভীতি জন্মাইত না। দেখিলেই মনে হইত এ গাম্ভীর্য্যে অপার প্রেম আছে—আর এই আগমন, প্রেম-মিলন-আকাঙ্ক্ষায়! সাক্ষাৎ হইলে মুহূর্ত্তের ভিতরেই সেই গাম্ভীর্য্য আনন্দে, নির্ম্মল হাস্যে, নির্দ্দোষ আমোদে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান।

তাঁহাদের যৌবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল চরিত্র-মহিমা ও ধর্ম্মসাধন-সফলতা ব্রাহ্মধর্ম্ম নগরেও গ্রামে প্রচারের

পক্ষে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। মহর্ষির উপদেশ, তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান রাজধানী হইতে দূরে নগরে ও পল্লীতে যুবক-দিগের ভিতরে ব্রাহ্মজীবনাদর্শের আভাস উপস্থিত করিয়াছিল। সেই নবীন আদর্শের প্রভাব গিরিশচন্দ্রের জীবনকেও আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে সময়েই আবার কেশবচন্দ্রেরও আবির্ভাব। ইহাঁদের কাহারও সহিত তাঁহার প্রথম জীবনে সাক্ষাৎ না হইয়া থাকিলেও, দূরে বসিয়াও ইহাঁদের জীবনের প্রভাব যে তিনি সম্যক অনুভব করিতে-ছিলেন, এবং তাহার জীবন-গঠনে, মতপরিবর্ত্তনে যে ইহাঁরা তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। থিওডোর পার্কারের প্রভাব সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবন ও মত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তিনি বলিতেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, উজ্জ্বল নির্ম্মল বিবেক, প্রেম-পবিত্রতা-সাধন ;—পার্কারের ধর্ম্ম-সাধন-প্রণালীর এইগুলি যেমন মূল সূত্র, আমাদের শাস্ত্রেও তেমনি অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময় কোষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পার্কারের প্রণালী ও আমাদের শাস্ত্রীয় প্রণালী মূলতঃ একই সাধন-তত্ত্বের অন্তর্গত।

গার্হস্থ্য জীবন।

তিনি বলিতেন, "গৃহিনী যেমন অন্ন বিতরণ করেন, পরিবারের আধ্যাত্মিক অন্নও তিনিই বিতরণ করিবেন।" তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন এই আদর্শে নিয়মিত ও গঠিত হইয়া-

ছিল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইবেন, পরিবার-পালনে যেমন স্বামীর সাহায্য করিবেন, তেমনি পরিবারের কেন্দ্র হইয়া পত্নী ধর্ম্ম-বিতরণেও স্বামীর সহায় হইবেন। এই আদর্শকে নিজ পরিবারে সফল করিবার জন্য তিনি কতই না যত্ন করিলেন। নিজ ভার্য্যাকে নিম্নসোপান হইতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া তিনি কত বিধানেই তাঁহাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিলেন। এবিষয়ে তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইলেও তিনি কিছুতেই হার মানিতেন না। হিন্দু সমাজের কুলবধূকে নিজের পত্নীরূপে পাইয়া আপনার মহৎ ধর্ম্মাদর্শের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে তাঁহার আয়াস ও যত্নের সীমা ছিল না। তাঁহার পারিবারিক ধর্ম্মাদর্শ যে সর্ব্বথা তিনি সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীকে যে তিনি বাস্তবিকই সহধর্ম্মিণী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন। যতদিন না তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্ম-দীক্ষায় পত্নী ব্রাহ্মসমাজের বেদী অধিকার করিয়া সকলের সমক্ষে উপাসনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হন নাই।

"বাজপক্ষী অন্য পক্ষী হনন করিয়া সন্তান পালন করে" এরূপ প্রেম, প্রেম নয়, এরূপ অপত্যস্নেহকে অপত্যস্নেহ বলা যায় না—মানুষের প্রেম হইবে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম। মানুষ তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ঈশ্বরের দান বলিয়াই গণ্য করিবে, তাহাদের মুখে ও তাহাদের

ভিতরে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও করুণা উপলব্ধি করিবে—ইহাই গিরিশচন্দ্রের পরিবার-স্নেহ—ইহাই তাঁহার প্রেম। তাঁহার এই ধারণা ও আদর্শ ছিল যে, যতক্ষণ মানুষ আপন পরিবার পরিজনকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, ততক্ষণ মানুষ নিরভিমান হইতে পারে না, ততক্ষণ মানুষ নিজ আমিত্ব বর্জ্জন করিতে পারে না। তবু তাঁহার এক অভিমান ছিল, সে অভিমান তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি; তিনি আপন পত্নীকে এরূপ আদর্শ রমনী করিতে চাহিয়াছিলেন যে, পত্নীর কোন দোষ ক্রটী সহ্য করিতে পারিতেন না; স্বকীয় ধর্ম্মাদর্শ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। ব্রাহ্ম হইয়াও হিন্দুসমাজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রেম খর্ব্ব হয় নাই। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, "তোমার দ্বারা আমার আত্মীয় স্বজনের যদি কোন অনাদর হয়, তবে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদও সংঘটিত হইতে পারে।"

নিঃস্ব হইয়াও আপন কন্যাদের বিবিধ শিক্ষা বিধানে তাঁহার যত্নের ক্রটী ছিল না। জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মশিক্ষা, উপাসনা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার যত্ন বহু পরিমাণে সফল হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়।

দরিদ্র হইয়াও আপনার পরিজন ও অভ্যাগত অতিথি

ও আত্মীয় স্বজনের আহার-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি নিজেই বাজার করিতেন, নিজ হস্তে সানন্দে বাজারের জিনিস বহন করিয়া গৃহে লইয়া আসিতেন। কোনও দিনও কোনও জিনিসের দর করিতেন না। সাধুতারও একটা প্রভাব ও মূল্য আছে; বাজারের বিক্রেতারা তাঁহাকে সত্বরই চিনিয়া ফেলিত, তাঁহারা তাঁহাকে কিছুতেই ঠগাইত না। এ উপলক্ষে একটা গল্প মনে পড়িল। একবার আমরা কোন বিবাহে কলিকাতা গিয়াছিলাম। আমরা একই গৃহে থাকিতাম। একদিন দেখিতে পাইলাম, তিনি চাঁদনীর বাজার হইতে কতকগুলি জুতা ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশ, চাঁদনী গিয়াছিলে, দরদস্তুর করিয়া কিনিয়াছ তো?" তিনি উত্তর করিলেন, "না, আমার কাছে যাহা চাহিয়াছে আমি তাহাই দিয়া আসিয়াছি।" সকলে তখন বলিয়া উঠিল, "গিরিশ চাঁদনীতেও ধর্ম্ম করিতে গিয়াছিল।" তাঁহার ধর্ম্ম এমনই ছিল বটে; মন্দিরে, গৃহে, রাজপথে, বিপণিতে, বাজারে সর্ব্বত্রই তাঁহার একই ধর্ম্মাদর্শ। তাঁহার ধর্ম্ম শুদ্ধ ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ছিল না, তাঁহার ধর্ম্ম শুদ্ধ প্রার্থনার আধ ঘণ্টার জন্য ছিল না, তাঁহার সরল স্বাভাবিক ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই ছিল। এই ধর্ম্মাদর্শ তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সকল বিভাগকেই নিয়মিত করিত।

শিক্ষকতা।

শিক্ষকের দুইটী মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক। একটী যাহাকে ইংরাজীতে বলে—personality ; এমনই একটা ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্বের একটা স্বাভাবিক প্রভাব ও আকর্ষণ সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়। কোন হাওয়ার ভিতরে যদি সুমধুর ধ্বনি হইতে থাকে, তা যেমন সমস্ত স্থানকে মধুরতায় পূর্ণ করে, তেমনি এক একজন লোক আছে, যাঁহারা কোথায়ও উপস্থিত হইলে স্বতঃই মনে হয় কি যেন একটা আলোক আসিল, কি যেন এক অপূর্ব্ব মধুরতার আবির্ভাব হইল। তাঁহারা আসিলেন অমনি সেখানে যাহা কিছু অপ্রীতিকর ছিল, নিমেষের ভিতরে বদলাইয়া গেল। আমরা নিজেরা দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, বিদ্যালয়ে গিরিশ-চন্দ্রের এমনি একটা সুমধুর আকর্ষণ ছিল ; তিনি হাসিতে হাসিতে আমাদের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেই মনে হইত—জীবন ও আনন্দ আবিভূর্ত হইল। শিক্ষকের দ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনি যাহা পড়াইবেন তাহা অপেক্ষাও তাঁহাকে অনেক বেশী জানিতে হয় ; এমন জানা যাহাতে প্রতিদিনের পাঠ তাঁরই হাতের মুটের ভিতরে থাকে, বিষয়টাকে তিনি নিজ ইচ্ছামত নানারূপে উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি নিজে বিষয়ের মধ্যে হারাইয়া যান না, কিন্তু বিষয় তাঁহারই জ্ঞানের ভিতরে হারাইয়া যায় ; বিষয় তাঁহার উপরে উঠিয়া নিরন্তর পাঠ দিবার সময় তাঁহার আশঙ্কা ও চিন্তা উৎপাদন

করে না ; কিন্তু বিষয় সর্ব্বথা তাঁহারই শাসনাধীনে থাকিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে শোভন, সুন্দর, চিত্তাকর্ষক হইয়া নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের এই বিষয়ে আশ্চর্য্য শক্তি ছিল ; তিনি পাঠ দিবার কালে পুস্তকাদির উপরে অনেক সময়েই নির্ভর করিতেন না ; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শিক্ষাদিবার কালে, আমার স্পষ্টই মনে আছে, তিনি পুস্তক এককালে পরিত্যাগই করিতেন। ইতিহাস-শিক্ষায় তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষা-সম্পদ ও তাঁহার নানা বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার পাঠদানকে অতি রমনীয় করিয়া তুলিত। তিনি জীবিকার জন্য শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, আমরা শিক্ষকের আদর্শগুণগুলির আশ্চর্য্য বিকাশ তাঁহার ভিতরে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বর্ত্তমানকালে শিক্ষা-ব্রতধারিগণ তাঁহার আদর্শ মনে রাখিলে মহামঙ্গল হইতে পারে ; একথা মনে রাখিলে ভাল হয় যে, personality চরিত্র ও ধর্ম্ম ভিন্ন সম্ভবেনা।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য।

আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য অনেকটা পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় সমাজের 'Pastor'এর কার্য্যের অনুরূপ ছিল। তিনি যেমন আস্তিকতায় সহায়, তিনি যেমন ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন, তিনি যেমন মন্দিরে উপাসনা করিতেন তেমনি গৃহে গৃহেও উপাসনার কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত ;

এক একদিন কখনও ৩।৪ স্থানে দিবসের ভিতরে তাঁহাকেই একাকী উপাসনা করিতে হইত। পরিবারে পরিবারে মহিলাদিগকে কি ধর্ম্মশিক্ষা কি অন্যবিধ শিক্ষা তিনিই দিতেন। তখনকার যুগের স্থানীয় ব্রাহ্মমহিলাগণ অনেক পরিমাণে সাধারণ শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি একদিকে সমাজ ও পরিবারে আত্মিক খাদ্য ও ধর্ম্মান্ন বিতরণ করিতেন, অন্যদিকে রোগে শোকে তিনি সেবকও সান্ত্বনাদাতারূপে গৃহে গৃহে উপস্থিত হইতেন। তখনকার কালে এদেশে সেবাব্রত প্রচলিত ছিল না। এখন যেমন নানা সমাজ হইতে সেবাব্রতধারী যুবকবৃন্দ পরসেবাব্রত-রূপ মহৎকার্য্য করিয়া দেশের কল্যাণ করিতেছেন; তখন এবম্বিধ ব্রতে লোক অগ্রসর হইত না, এই সেবাব্রত তখন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় সমাজে ব্রাহ্মসমাজই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাহার স্বাস্থ্য, সবল সুদৃঢ় শরীর তাঁহাকে এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তিনি একাকী এ্কক্রমে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেন। একাদিক্রমে একাদশ রাত্রি রোগীর সেবায় রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, এমন ঘটনাও তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে। তাঁহাকে পাইলে প্রতি পরিবারে রোগী মনে করিত যেন তাহার রোগের উপশম হইল, কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, তিনি

আসিলেই রোগীর সান্ত্বনা হইত, রোগী নির্ভয় হইত, মনে করিত তবে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

এখন যেমন বাঙ্গলাভাষার লিখন ও কথন প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তেমন ছিল না। প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে কিছু বলিয়া যাওয়া সে যুগে এক অভিনব ব্যাপার ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগে লিখিত উপাসনা ও উপদেশাদির নিয়ম ছিল। বরিশালে, আচার্য্য গিরিশচন্দ্র এবিষয়ে এক নবযুগের পত্তন করিলেন তিনি বেদীতে বসিয়া তাঁহার সুমধুর গম্ভীর ভাষায় মৌখিক উপাসনা করিতে লাগিলেন, কখন মুখে, কখন লিখিত ভাবে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গভাষার এই নূতন বিকাশ উপাসক ও শ্রোতৃবর্গের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইত। তাঁহার আরাধনা প্রণালী সম্পূর্ণ নিজস্ব, এরূপ স্বরূপ-ব্যাখ্যার রীতি এখন আর ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সাধারণতঃ শুনা যায় না। ভাষা এমন সতেজভাবের সহিত অনর্গল বহির্গত হইতেছে, সে যুগে ইহা বড়ই নূতন ব্যাপার ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা।

তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজের আরাধনা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, অন্য কোন সমাজে এরূপ প্রণালী দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজ এদেশের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।

একদিকে যেমন মানব আত্মাতে তিনি, আমার আত্মাতে তিনি, এই ভাবের আধিক্যে, "সোঽহং" বাদের সৃষ্টি হয়; তেমনি ঘটে ঘটে শক্তি, আকাশে ভূধরে সাগরে, বৃক্ষলতায় শক্তি, ইহাতেও প্রকারান্তরে বহুদেববাদের সৃষ্টি হইতে পারে; তাই ব্রাহ্মসমাজ এই দুইভাবের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, আত্মায় ঈশ্বর প্রকৃতিতে ঈশ্বর, তাঁহারি ধ্যানে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত একত্ব উপলব্ধি—এই দ্বিবিধ ভাব ধর্ম্মতত্ত্বে দ্বৈতাদ্বৈত নামে গ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মাদর্শ ও সাধনা।

"একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া ফলাফল চিন্তা না করিয়া কার্য্য করা—এই আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলাম"—আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মাদর্শের ইহাই মূল-ভিত্তি। একদিকে মনোজগতে যেমন এই আদর্শ, তেমনি কর্ম্মজগতের আদর্শ "স্বার্থবিসর্জ্জন"। তিনি এতদূরও মনে করিতেন, স্বার্থ চিন্তা পরিহার করিয়া এক গ্লাস জল দান বা পান করিলেও ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহার উপাসনায় ও উপদেশে শেষ জীবনে এই স্বার্থ-বিসর্জ্জন-তত্ত্বই বিশেষভাবে প্রকটিত হইত। ধ্যান ধারণায় এই ভাব রক্ষা করিলেই ধর্ম্মজীবন হয় না, সকল কর্ম্মে এই আদর্শ পালন করিয়া চলিতে হয়, তাঁহার জীবনে মননে ও কর্ম্মে এই আদর্শ রক্ষা করিয়াই চলিত। তাঁহার দ্বিতীয় সাধন-তত্ত্ব "প্রেমে সাম্য"—এক সময় বলিয়াছিলাম সাম্যবাদ

যুক্তিতঃ সিদ্ধ নহে, তবে এক স্থলে মাত্র সাম্যবাদ রক্ষণীয়; সে সাম্য মহাজন-জীবনের সাম্য, মহাজনগণ নিজ নিজ জীবনে প্রেমের সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন; আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের জীবনে এই প্রেম-সাধনার অপূর্ব্ব লীলা দৃষ্ট হইত। নিতান্ত কুক্রিয়াসক্ত লোকের প্রতিও তাঁহার প্রেম ছিল সে প্রেম সেই ব্যক্তির কুক্রিয়া বশতঃ কোনদিনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি যাহাকে যে গুণের জন্য ভাল বাসিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোন কু-আসক্তির জন্য তাঁহার ভালবাসা কোনদিনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। মানুষ দোষগুণে গঠিত; গুণের জন্য যে প্রেম অর্পিত হয়, গুণের পক্ষপাতী হইয়া দুই হৃদয়ে যে যোগ হয়, অপরাধ থাকিলেও সে যোগ ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ ঘটে না; কারণ ঈদৃশ সাম্যবাদী পুরুষেরা মনে করেন, আত্মায় আত্মায় শুভবিষয় অবলম্বন করিয়াই যোগ স্থাপন হইয়াছে, যোগ কুক্রিয়া বা অপরাধের যোগ নয়; অতএব সেই মঙ্গল বা শুভ যোগ কল্যাণ প্রসূই হয়। তাঁহার প্রেম-সাম্যের দ্বিতীয় লক্ষণ এই—ইহা শ্রেণীভেদ উচ্চনীচের ভেদাভেদ স্বীকার করিত না; রোগীর সেবায় পরোপকারে এপ্রেম সর্ব্বপ্রকার ভেদনীতি অগ্রাহ্য করিয়া চলিত। তাঁহার তৃতীয় সাধন তত্ত্ব সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য। কিরূপে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইল? তিনি মনে করিতেন স্ত্রী পুত্র পরিবার, এই সংসার যাবতীয় ভোগ্য ও কাম্য পদার্থ সমস্তই ঈশ্বরের দান, এবং এ সকলকে

সেই চক্ষে দেখিতে হইবে—সেই চক্ষে ভোগ করিতে হইবে। নরনারীর মুখে, প্রকৃতিতে তাঁহাকেই দর্শন কর, সর্ব্বক্ষণ এইরূপ দর্শনে জীবন নিয়মিত কর—"ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বং" জগতের সমস্ত তাহাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ভোগ কর। এইরূপ ভোগ করিতে গেলে, পরিবার সংসার, প্রকৃতি সমস্ত দিগেই হৃদয় মনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লইতে হয়, জীবন সম্পূর্ণ নবীন সুরে বাজিতে থাকে।

উপসংহার।

এই জীবন, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল—তাঁহার ভিতর বাহির যেমন আমরা দেখিতে পাইতাম, তাঁহার যেমন কোন গোপনের প্রয়োজন হইত না; তেমনি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আমরা আমাদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতাম—দেখিতে পাইতাম আমরা কত ক্ষুদ্র ও কত সামান্য। কথোপকথনে তাঁহার বাক্যস্রোত তাঁহার অনাবিল পবিত্র হৃদয়ের ভাবগুলি সরস মধুর ভাবে যখন প্রকাশ করিত, আমরা জানিতাম কথা কহিতে হইলে আপন প্রাধান্য রক্ষা, অপরকে আক্রমণ, আত্ম অহঙ্কার ইত্যাদি যত রাজসিক ও তামসিক ভাবের প্রকাশ হয়, তাঁহার কথায় তাহা নাই; প্রাণশক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি নিয়ত সাত্ত্বিকতার পথ ধরিয়াই চলিত; নিয়ত নানাবিধ তত্ত্বই প্রকাশ করিত ও বিভোর হইয়া আপনার হৃদয়ের নির্ম্মলতা

শুদ্ধতাই প্রকাশ করিয়া যাইত। এই সদানন্দ হাস্যপূর্ণ মুখের গাম্ভীর্য্য ও সাম্য ঋষিজনেরই উপযুক্ত। বঙ্গদেশের এই অভিনব যুগ-সন্ধিকালে এই ঋষি আপন গৃহ-আশ্রমে আপন সহধর্ম্মিণী পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া ধর্ম্ম-তপস্যায়ই নিযুক্ত ছিলেন, আপনার ধ্যান-ধারণা, আপনার অমূল্য জীবন-সম্পদই মানব সমাজে নিয়ত বিতরণ করিতেন। আমাদের চক্ষের সমক্ষে ঋষিত্বের ভিতরে ধর্ম্ম ও সংসারের ভেদ ঘুচাইয়া—স্বকীয় প্রেম-সাম্যব্রত উদ্‌যাপন করিতে করিতে আচার্য্য অমৃত-নিকেতনে মহাপ্রস্থান করিলেন।

২০শে জানুয়ারী, ১৯১০
মঙ্গলবার, বরিশাল।

শ্রীসত্যানন্দ দাস।